"Sahitya Prabandha" collection of Essays
by Dr. Shyamal Roy

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪-পরগণা

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রচ্ছদ :
রতন মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

# নিবেদন

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স ও এম. এ. বাংলার পাঠ্যসূচীতে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা আবশ্যিক। প্রবন্ধগুলি সামগ্রিক ভাবে পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও তার পরিধি এত বিরাট ও বিষয়বস্তুর গভীরতাও এত বেশী যে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধকে বিভীষিকা বলে মনে করে থাকে। বিগত কয়েক বৎসর ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে যে প্রবন্ধগুলির রূপরেখা প্রস্তুত করেছিলাম 'প্রভা প্রকাশনী'র তরুণ কর্ণধার শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল সেগুলি মুদ্রিত করে প্রকাশের ব্যবস্থা করায় ছাত্র-ছাত্রীরা নিশ্চয়ই যথেষ্ট উপকৃত হবে।

প্রবন্ধগুলি লিখতে গিয়ে প্রতিটি বিষয়েই বিশেষজ্ঞদের সুপরিচিত গ্রন্থগুলি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উল্লেখপঞ্জীতে গ্রন্থকার ও গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করা হলো। তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মেটালে আমার শ্রম সার্থক হবে।

শ্যামল রায়

## সূচীপত্র

# মঙ্গলকাব্যে সমাজ-দেবতা-মানুষ

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ ছ'শো বৎসর ধরে বাংলা ভাষায় দেবমাহাত্ম্যমূলক যে বিশেষ গঠনরীতি অনুসরণে রচিত আখ্যানকাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা বাংলা সাহিত্যে 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের নামকরণ নিয়ে নানা ধরণের ব্যাখ্যা সমালোচকেরা দিয়ে থাকেন। প্রাচীন ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রে 'মঙ্গল' বা 'মঙ্গলকৌশিকী' নামে একটি উপরাগ অথবা রাগিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। সংগীতে শাস্ত্র সূত্রে প্রাপ্ত 'মঙ্গল' নামটিকে অবলম্বন করেই মঙ্গলকাব্য এদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সংগীত শাস্ত্রের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলা চলে প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত অন্যান্য কাব্যশাখার মতই মঙ্গলকাব্যও গীত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয়েছিল। আদিতে এই জাতীয় কাব্য সম্ভবত মঙ্গলরূপে গাওয়া হতো বলেই রাগের নামকে আশ্রয় করেই কাব্যরীতির নামকরণ হয়েছে মঙ্গলকাব্য। এছাড়া জয়দেব গোস্বামী রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যেও 'মঙ্গল-সমুজ্জ্বলগীতি' বাক্যাংশে 'মঙ্গল' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন-কালের বাংলায় 'মঙ্গল' ও 'গীত' শব্দ সমার্থক ছিল বলেই চৈতন্য ভাগবতে, 'কৃষ্ণমঙ্গল', কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'মঙ্গল নাট' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গল শব্দের অর্থ বিবাহ বা শুভ অনুষ্ঠান হিসাবেও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে। সেদিক থেকে দেব-দেবীর বিবাহ বর্ণনামূলক কাব্য বা শুভ অনুষ্ঠানে গেয় কাব্য হিসাবে চিহ্নিত করার জন্যও এই জাতীয় কাব্যের নামকরণ মঙ্গলকাব্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

কোনো অপ্রিয় প্রসঙ্গকে বিপরীতার্থক শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করার রীতিকে বলা হয় সুভাষণ। মঙ্গলকাব্য নামকরণের ক্ষেত্রেও সুভাষণের রীতিটি গৃহীত হতে পারে তার কারণ হলো মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত অধিকাংশ দেব-দেবী হলেন অমঙ্গলকারী। তাঁদের অমঙ্গলকারী শক্তিকে প্রশমিত করে পরিবারের কল্যাণ কামনায় ঐ সমস্ত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য গান করা হয় বলে

এই জাতীয় কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে অভিহিত করা হতে পারে। অবশ্য পরবর্তীকালে মঙ্গলকারী-অমঙ্গলকারী ভেদে সব দেবতার মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্যকেই মঙ্গলকাব্য নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেকে মনে করে থাকেন এক মঙ্গলবার থেকে শুরু করে অন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে পাঠ করে মঙ্গলকাব্য পাঠ সম্পূর্ণ করা হতো বলে কাব্য পাঠের শুরু ও সমাপ্তি দিবসের দিকে ইঙ্গিত করে কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে মঙ্গলকাব্য।

তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ রীতিকে অবলম্বন করে দেবমাহাত্ম্যমূলক যে কাব্যগুলি মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল তাকে মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

রচনারীতির দিক দিয়ে প্রথানুগত্য গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেওয়ার ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির অধিকাংশই গতানুগতিক হয়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হলেও চতুর্দশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট কোনো রূপ গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। মূলতঃ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বিষয়বস্তু ও রাজনীতির দিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যগুলি গতানুগতিক হয়ে উঠতে শুরু করে। তখন থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়কই স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু, বিশেষ কোনো দেবতার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে তিনি মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হলেও সংশ্লিষ্ট দেবতা ছলে বলে কৌশলে তাঁকে দিয়ে পূজা প্রচার করবেন এবং এই দেবতা তাঁকে অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করে তাঁর জীবনে সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবেন। উপাস্য দেবতার কৃপায় রক্ষা পাওয়ার নিশ্চিত ধারণা গড়ে ওঠার ফলে অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে ভক্ত বা পূজা প্রচারকারী মানুষটি উদ্দিষ্ট দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করায় তাঁর মনুষ্যত্বটুকু অনেকাংশেই ম্লান হয়ে পড়েছে। দৈবশক্তির নির্ভরতা ও অলৌকিক ঘটনার আড়ালে মানব চরিত্রের সক্রিয়তা প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। দেববাদের প্রতিষ্ঠা মঙ্গল-কাব্যের মুখ্য অভিপ্রায় হওয়ায় মানুষ দেবমহিমার আড়ালে প্রায় অদৃশ্য থেকেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা পূর্ববর্তী কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। প্রথমে গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, তারপর গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বর্ণনা, সৃষ্টিরহস্য বর্ণনা, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন

যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাসে হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, পার্বতী, চণ্ডী বা শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন কোনো দেবতার (যেমন মনসা) নিজের পূজা প্রচারের চেষ্টা, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অবশেষে পূজা প্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেব-শিশুর উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা প্রচারের পর স্বর্গে ফিরে আসার মত নানা ঘটনা নিয়ে মঙ্গলকাব্যগুলির আখ্যানাংশ গড়ে উঠতে দেখা যায়।

বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা (বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তব) ইত্যাদি প্রায় সব মঙ্গলকাব্যেরই অপরিহার্যবস্তু। পাকপ্রণালী, বিবাহের আচার অনুষ্ঠান বর্ণনা, বিশ্বকর্মার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান, নারীর সতীত্ব পরীক্ষা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি নানা বিচিত্র বিষয় মঙ্গলকাব্যের দেবমাহাত্ম্যমূলক আখ্যান বর্ণনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা তথা সমাজজীবনের পরিচয় স্পষ্ট করে তুলেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্মীয় প্রয়োজনে রচিত হলেও দেবভক্তির আড়ালে এই শ্রেণীর কাব্যগুলিতে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান পতনের ফলে সাধারণ মানুষের হতাশা, নৈরাশ্য ও অসহায়তার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাসকশক্তি, অভিজাতশ্রেণীর মানুষ বা উচ্চবর্ণের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে নানাভাবে লাঞ্ছিত মানুষ নিজেদের জীবনের নৈরাশ্য, দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাত্রা বা লাঞ্ছনার জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠার মত শক্তি অর্জন না করায় সমস্ত রকম বিপর্যয়ের জন্য সে নিজের ভাগ্য বা দেবতার অভিশাপকেই গ্রহনীয় বলে মনে করেছে এবং প্রবল নৈরাশ্যের মধ্যে একটু আশার আলোর মত দেবতার অনুগ্রহ চিন্তা ভাগ্যহত মানুষের জীবনে ক্ষীণতম আশাবাদের সঞ্চার করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বিনীত মানুষের অত্যাচার, রাজরোষ ইত্যাদির প্রসঙ্গ দেবমাহাত্ম্যমূলক মঙ্গলকাব্যে ঐশী চেতনার পরিবর্তে বাস্তব লাঞ্ছিত জীবনের গ্লানিকর রূপকে স্পষ্ট করে তুলেছে। মধ্য-যুগীয় মঙ্গলকাব্যের মানব চরিত্র প্রবল প্রভাবান্বিত দেবচরিত্রের পাশে ম্লান হলেও মঙ্গলকাব্যগুলি যে একেবারে মানবচেতনাশূন্য এমন কথা বলা যাবে না।

শিব বা শিবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর পূজাপ্রচার মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয় বিষয়বস্তু রূপে স্বীকৃত এবং সেই সঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলিতে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বত্যাগী, নিরাসক্ত শিবের প্রভাবকে অস্বীকার করে শুধু কাব্যে নয় সমাজের উপরেও শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা।

অনার্য অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের কাছে শিবের পরিচয় হলো কৃষিদেবতা রূপে। কৃষকদের জীবনের নানা সমস্যা সমাধান করে কৃষিক্ষেত্র থেকে জোঁক মশা ইত্যাদি দূর করে কৃষককে কৃষি কর্মের উপযোগী পরিবেশ ও কৃষিকর্মের প্রণালী শিখিয়ে দিয়ে তিনি অবসর বিনোদনের জন্য মাদকদ্রব্য ও নারীসঙ্গ গ্রহণ করেছেন। তিনি দরিদ্র শ্রেণীর উপাস্য দেবতা বলেই তার চরিত্র চিত্রিত হয়েছে দরিদ্ররূপে। তিনি সৃষ্টির আদি দেবতা ও আদিনাথ হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের দেবতা ও তাঁর অবসর বিনোদনে কামচারিতার প্রভাবে কল্যাণের দেবতা শিবকে কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ চরিত্ররূপে মঙ্গলকাব্য-গুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শিব-চরিত্রের উপরে যে মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুদের জীবনযাত্রা ও তাদের কুরুচিপূর্ণ বিনোদন ব্যবস্থার প্রভাব পড়েনি এমন কথাও বলা চলে না। মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে 'গোরক্ষবিজয়ে' বর্ণিত শিব চরিত্রের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে। সেখানে শিবের কামুক রূপের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে—

'ভাঙ খাইবে ধুতরা খাইবে খাইবে শতাবরি।
দিবারাত্র থাকবে তুইন কুচ নারীর বাড়ী॥
ষোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ।
অপেক্ষা না মিটবে তব কা'মনীর সাঁত॥

মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতেও শিবের নানা রুচিবিগর্হিত কার্যকলাপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র শিব দরিদ্র কৃষক সমাজের দেবতা হিসাবে পরিকল্পিত কিংবা শিব-শক্তিবাদের উপর মনসার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মনসা-মঙ্গলকাব্যের শিব-চরিত্রকে কালিমাযুক্তরূপে অঙ্কিত করা হয়নি তার অন্য একটি কারণ ছিল বলে অনুমান করা যায়। মধ্যযুগের সমাজ পরিবেশে যখন প্রচণ্ড দুর্যোগ দেখা দিয়েছে এমন একটা সামাজিক পরিবেশে শিবের মত নিশ্চেষ্ট, অলস দেবতার পরিকল্পনা একান্তভাবে অচল বলেই যুগ পরিবেশের প্রভাবে দারিদ্র্যমুক্তি, নৈরাশ্য ও হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে পরিত্রাণের আকুতির জন্য ভিন্নতর শক্তিময়ী দেবী পরিকল্পনা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল বলেই মঙ্গল-কাব্যের কবিরা বরাভয়দাত্রীরূপে শক্তিদেবীর পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'বস্তুত সাংসারিক সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করতে গেলে সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না।' তাই স্বাভাবিকভাবেই লৌকিক জগতের অসহায় মানুষ শিবকে

পরিত্যাগ করে শক্তিকে আঁকড়ে ধরার পরিকল্পনা করেছেন। আত্মভোলা শিবের সঙ্গে কল্যাণময়ী স্নেহপ্রবণা দেবী শক্তির যে দ্বন্দ্ব মঙ্গলকাব্যগুলিতে লক্ষ্য করা যায় সে দিকে ইঙ্গিত দিয়ে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন—'একদিকে তা অনাসক্ত কর্মভোলা লৌকিক দেবতা শিবের বিরুদ্ধে সক্রিয় শক্তির সংগ্রাম, অপর দিকে তা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অঙ্কিত মনোধর্মী শিবের বিরুদ্ধে প্রাণধর্মী শক্তির বিদ্রোহ।' সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে যে বিরোধ তা সব সময় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সূক্ষ্ম ও জটিলরূপে আকারে ইঙ্গিতে পরোক্ষভাবে আভাসিত হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের বাংলায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে তাই স্বাভাবিক ভাবেই আর্য-অনার্য, লৌকিক-পৌরাণিক, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র দেববাদের অন্তরালে বর্ণিত হয়েছে।

লৌকিক জীবনে মানুষ চায় পার্থিব ভোগসুখ ও সমৃদ্ধি। অর্থ, স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তা, পুত্র-কন্যার কল্যাণ কামনা সাধারণ মানুষের কাছে প্রাধান্য লাভ করে। এই পার্থিব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থেকেই মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবদেবী চণ্ডী, মনসা, দক্ষিণরায়, শিব প্রমুখের কাছে ভক্তজনের প্রার্থনা ও দেবতার কৃপা উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। রামেশ্বরের শিবায়নে শিব তাঁর ত্রিশূল ভেঙ্গে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে জোয়াল, কোদাল, ফাল ইত্যাদি চাষের সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে ভক্তের দুর্দশা মোচনে উদ্যোগী হয়েছেন। কৃষিকর্মকে দারিদ্র্যমোচনের অন্যতম অবলম্বন জেনেই 'শূন্যপুরাণে' ভিক্ষাজীবী শিবকে ভক্ত কৃষিকর্মে উৎসাহ দিয়ে চলেছে—

> 'আক্ষার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চসচাষ।
> কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥'

পার্থিব জীবনের দুঃখ বেদনার অভিঘাতে জর্জরিত মানুষ তার জীবনের নানা সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সমস্যাশ্রয়ী মানব জীবনের এই ব্যাকুলতা থেকে মুক্তির অবলম্বন হিসাবে মঙ্গলকাব্যের দেব চরিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছে। তাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগের বাঙালী মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে দেবতার মিলন হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। দেবতার কৃপায় অনার্য ব্যাধ কালকেতু রাজা হয়েছে, ধনপতি ও চাঁদ সদাগর চণ্ডী ও মনসার কৃপায় তাদের হৃতসম্পদ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এই ফিরে পাওয়া শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্য কিংবা সার্থকতার পরিচয় বহন করে না, তার চেয়ে বড়

সাফল্য হলো পুরাতন প্রভুত্ব বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার অচলায়তন ভেঙে দিয়ে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটানো। কালকেতুর সাফল্যে অনার্যসংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতির উপর প্রাধান্য লাভ করেছে, ধনপতি ও চাঁদ সদাগরের সাফল্য ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্তর বৈশ্যশ্রেণীর প্রভুত্ব স্বীকৃতি লাভ করায় নূতন সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে আভাসিত হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের বাংলায় বণিক শ্রেণী যে প্রাধান্য লাভ করেছিল বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা সমাজে দেবীপূজা প্রচার তার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। কেন রাজাদের রাজত্বকালে বণিক বা অন্যান্য শ্রেণীর আধিপত্য সমাজ থেকে বিলুপ্ত হলেও মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত ঘটনাদি থেকে অনুমান করা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলায় বৈশ্য শক্তি পুনরায় তাদের হৃতমর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। সুতরাং এ কথা বলা অন্যায় নয় যে, মঙ্গলকাব্যের কবিরা সচেতনভাবে ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ না করলেও মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের বিবর্তনের চিত্রটি নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাঙালীর জাতিগত পরিচয় নির্ণয় করতে গেলে দেখা যাবে বাঙালীর রক্তধারা অবিমিশ্র নয়। আর্য-অনার্য নানাশ্রেণীর মানুষের রক্তের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতি গড়ে উঠেছে। আর্য ও অনার্য জাতির পারস্পরিক প্রভাবে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে নানা ধর্মমত, উপাসনা পদ্ধতি ও দেবীমূর্তির পরিকল্পনা গড়ে উঠেছিল। শুধু ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নয়, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবে মধ্যযুগের বাঙালীর জীবনযাত্রা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। লৌকিক দেব-দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়। এই সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণ ও অনার্য-সংস্কৃতির যে প্রভাব বিস্তার মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

মঙ্গলকাব্য মূলত দেবমাহাত্ম্যমূলক কাব্য হলেও পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যানগুলির মাধ্যমে মানবিক অনুভূতিগুলি প্রাধান্যলাভ করেছে। বিভিন্ন দেব-দেবীর জন্মবৃত্তান্ত। সাংসারিক জীবনের বর্ণনা, পূজা প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য ক্রুরতা ইত্যাদির মধ্যে দেবতাদের বাহ্যরূপে আড়ালে মানবিক আচরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা দেব চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে এই জাতীয় চরিত্রে শুধু মহৎ ভাবের প্রতিষ্ঠা ঘটাননি। তাঁদের

অমানবিক ও অতিলৌকিক চারিত্র্যমাহাত্ম্যের সঙ্গে ঈর্ষা, ভয়, নীচতা, ক্রুরতা, খলতা ইত্যাদির পরিচয় দিতেও ভুলে যাননি। তাই মঙ্গলকাব্যের দেবতাও যেন মধ্যযুগের বাঙালী সমাজেরই একজন হয়ে উঠেছেন। দেব চরিত্রের পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের মানব চরিত্র অনেকাংশে দুর্বল হলেও চাঁদ সদাগরের শৌর্যবীর্য, বেহুলার সতীত্ব, সনকার বাৎসল্যবোধ, ফুল্লরার স্বামী প্রেম, ভাঁড়ু দত্তের শঠতা ইত্যাদি আমাদের সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটে মানবচরিত্রের গভীরে যে সমস্ত গুণ ও দোষের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় তার সবটুকু মঙ্গল-কাব্যের নরনারীর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের মুহূর্তে রচিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক দেবদেবীরা তাঁদের পুরাতন মহিমা হারিয়ে প্রায় মানবিক হয়ে উঠেছেন। শিবের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণনার চেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত শিবকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রবণতা বড় হয়ে উঠেছে বলে মহাদেবের কাছে শিশুদের কৌতুককর প্রত্যাশা—

'কেহ বলে জটা হৈতে বাহির কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥'

হরগৌরীর গার্হস্থ্যজীবনও একান্তভাবে লৌকিক জীবনের অনুসরণে গড়ে ওঠে বলে শিব দুর্গাকে অনায়াসে বলতে পারেন—

'বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া ॥

অভিজাত শ্রেণীর সীমারেখা অতিক্রম করে যে বৃহত্তর লৌকিক জীবন দেশব্যাপী বিস্তৃত। মধ্যযুগের বাংলায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেই বৃহত্তর জীবনচেতনারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতা ও মানুষ একাকার হয়ে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ ও জীবনযাত্রাকেই যেন স্পষ্ট করে তুলেছে।

# যাত্রাগানের গতি প্রকৃতি

যাত্রা' বাংলার পুরাতন ও জনপ্রিয় অভিনয় রীতি এবং বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে সুপরিচিত। যাত্রাগান বা যাত্রাপালার সঙ্গে বাঙালী সমাজের প্রাণের নিবিড় সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই অভিনয়রীতি বা বিনোদন মাধ্যমটি কত পুরাতন সে সম্পর্কে সুনিশ্চিতরূপে কিছু বলা অত্যন্ত কষ্টকর।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'যাত্রা' শব্দের অ। দেব-কেন্দ্রিক উৎসব। যেমন রথযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা ইত্যাদি। আবার 'যাত্রা' বলতে সূর্যের কক্ষান্তর গমনের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। সূর্যের কক্ষান্তর গমনের ফলে যে ভাবে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমাদের ভৌগোলিক পরিবেশ, শস্য-উৎপাদন ব্যবস্থ', সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে যে সমস্ত ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন করা হতো তা যাত্রা শব্দের দ্বারাই বিশেষিত হয়েছে।

যাত্রা নাটকের উদ্ভব আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে এ দেশে বিনোদনমূলক যে গীতি-বাদ্য-নৃত্যের আয়োজন করা হতো তা থেকেই যাত্রা গানের উৎপত্তি। যাত্রাগানের আদি উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে 'নাটগীত' নামক পুরাতন রীতির নৃত্য-গীতাভিনয়ে। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের উত্তরা কাণ্ডে নাটগীতির প্রসঙ্গ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

'নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহ বেদ পড়ে কেহ পঢ়এ মঙ্গলে॥'

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' ইত্যাদি নাটগীতের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখিত হয়ে থাকে। যাত্রাগানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় জানিয়েছেন—'যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের উৎসব অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কেবলমাত্র নাটগীত বা গীতাভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তথাপি শব্দটি এই অর্থে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ তখন গীতাভিনয়ের মধ্যে নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়া ইহাকে নূতনযাত্রা' বলিয়া সর্বত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।' নূতন

যাত্রা শব্দের প্রয়োগ প্রাসঙ্গিক ভাবেই আমাদের পুরাতন যাত্রার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ক'রে তোলে।

সামান্য সংখ্যক অভিনেতা-অভিনেত্রী মিলে ধর্মীয় বিষয়কে অঙ্গ-ভঙ্গী-নৃত্যাদিসহ পরিবেশনের রীতি নাটগীতের সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা, রাম পাঁচালি বা রাম-রসায়ন গান পরিবেশনের মধ্যে আমার আধুনিকপূর্ব যাত্রার আদিরূপটিকে খুঁজে পেতে পারি। নূতন যাত্রা এদেশে জনপ্রিয়তা লাভের আগে 'কৃষ্ণযাত্রা' জন-সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—'প্রায় দুশো বছর পূর্বে জনৈক বিদেশী শিল্পীর আঁকা একটি কৃষ্ণযাত্রার ছবিতে দেখা যায়, বাদ্যযন্ত্ররূপে খোল ও করতালের ব্যবহার। রাতের অভিনয় ও অনুষ্ঠান যাতে দর্শকরা দেখতে পায় সেই জন্য মশাল জ্বলছে।' গীত-বাদ্য-অভিনয়সহ নৈশকালীন বিনোদন ব্যবস্থায় কৃষ্ণযাত্রা যে নূতনযাত্রার অগ্রচারী পথিক বিদেশী চিত্রকরের আঁকা চিত্রটি তা অবশ্যই প্রমাণ করে। সেকালের কৃষ্ণযাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' গ্রন্থে জানিয়েছিলেন—'রাত্রি দেড়টা দুটো থেকে যাত্রা শুরু হ'ত। লোকে ঘুমে ঢুলত। সেই জন্য তারা মন্দিরা ও করতাল বাজাত। সেই আওয়াজে ঘুমবাবাজি দেশ ছেড়ে পালাত।' কৃষ্ণযাত্রায় কেলুয়া-ভুলুয়ার যে ভাঁড়ামির ব্যবস্থা ছিল তা পরবর্তী যাত্রা ও থিয়েটারের আদিযুগেও অনুসৃত হয়। পুরাতন কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম সংগঠক (অধিকারী) ছিলেন গোবিন্দ অধিকারী। উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণযাত্রার লুপ্ত প্রায় ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। তিনি 'স্বপ্ন-বিলাস', 'রাইউন্মাদিনী', 'সুবল সংবাদ', 'নন্দ-বিদায়' প্রভৃতি পালা রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণযাত্রা ছাড়াও রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ইত্যাদি সঙ্গীত-নৃত্যবহুল অভিনয় রীতি পুরাতন বাংলায় প্রচলিত ছিল।

রামলীলায় যাত্রার মতই সাজসজ্জা ও অভিনয়ের মাধ্যমে রামকাহিনী পরিবেশন করা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায় যে, বিজয়া দশমী তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তদের বানরসৈন্য সাজিয়ে রামলীলা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন—

> 'বিজয়া-দশমী-লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
> বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
> হনুমান-আবেশে প্রভু বৃক্ষ শাখা লঞা।
> লঙ্কা গড়ে চড়ি' ফেলে গড় ভাঙিয়া॥'

রামযাত্রার মত অভিনয়সমৃদ্ধ মনসা গান বা মনসার ভাসান প্রাচীন বাংলায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল এবং এখনো কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রা, রামলীলা, মনসার গান সজীব হ'য়ে আছে।

গ্রাম বাংলায় পুরাতন অভিনয় রীতি ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায় 'লোটোর নাচ', 'গম্ভীরা', 'আলকাপ' ইত্যাদি লোকনাট্যের আঙ্গিকে। কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, মনসাগান যেমন ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত লোকনাট্যগুলি তেমন নয়। এগুলির মধ্যে সমাজের নানা দিককে স্পষ্ট করে তোলা হয়। এই জাতীয় লোকনাটে্যর সঙ্গে যাত্রায় সম্পর্ক একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একদিকে ধর্মীয় 'নাটগীত' ও অন্যদিকে লোকনাট্যের সংমিশ্রণে যে আধুনিক যাত্রা বা নূতন যাত্রা গড়ে ওঠে এমন কথা অস্বীকার করা যাবে না।

পুরাতন যাত্রা গানের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা কিভাবে বিষয়বস্তু ও ভাববৈচিত্র্যের দিকে এগিয়ে আসার ফলে বাঙালীর নাট্যচেতনা ও নাট্যরীতির পরিবর্তন ঘটে সে কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ডঃ সুশীল কুমার দে জানিয়েছেন—'The mimetic qualities of yatra, its realistic tendencies, its wearing out of consistent plot, its taste for a personal and lively dramatic story, its mingling of the comic and serious all these traits more or less ridicated the amorphous yatra might have passed into an indigenous from of the regular drama.'

পুরাতন যাত্রা গ্রামের অতি সাধারণ মানুষের আপাততুচ্ছ বিনোদন কলার জীর্ণ পরিচ্ছদ ত্যাগ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নগর কোলকাতায় বিত্তবান সমাজের আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনে শখের যাত্রা গড়ে ওঠে তাকেই নতুন যাত্রা বা Reformed Yatra নামে অভিহিত করা হয়। এই শখের যাত্রা থেকেই কালক্রমে ব্যবসায়ী যাত্রা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে।

পুরাতন কৃষ্ণযাত্রায় এক সময় রাধা-কৃষ্ণ লীলা ছাড়াও 'নল-দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে নাট্যাভিনয়ের যে রীতিটি প্রচলিত ছিল তাকে 'কালীয় দমন' বলা হতো। কালক্রমে কালীয় দমনের ধারাটি লুপ্ত হয়ে যায় এবং কৃষ্ণলীলার ধারাটি বেঁচে থাকে বলেই 'কানু ছাড়া গীত নেই' এমন প্রবাদ বাঙালী সমাজে প্রচলিত হয়। কিন্তু শখের যাত্রার উদ্ভব ঘটায় পুরাতন যাত্রার পৌরাণিক দিকটি যা কালীয় দমন নামে পরিচিত ছিল তার পুনরুজ্জীবন ঘটে যাত্রায় পৌরাণিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি সামাজিক ও

রাজনৈতিক বিষয়ও গুরুত্ব পেতে শুরু করে। যাত্রাপালার এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—'প্রাচীন বৈষ্ণব গীতিকাব্য এবং মহাজন পদরূপী সঙ্গীতের পরিবর্তে নতুন গান রচিত হ'তে থাকে। ধীরে ধীরে পশ্চিমা টপ্‌পা গানের প্রচলত কমতে থাকে। এই যাত্রাগুলি বিশেষরূপে লোকরঞ্জক ছিল। তার কারণ এগুলি ছিল নতুনত্বের স্বাদবাহী?

নতুন যাত্রার অন্যতম রূপকার হলেন গোপালচন্দ্র দাস। 'গোপাল উড়ে' নামে তিনি বাংলা যাত্রা তথা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। গোপাল উড়ে প্রথম শখের যাত্রাদল গড়ে তোলেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আখ্যান অবলম্বনে বৌবাজারের রাধামোহন সরকার প্রথম রাজা নবকৃষ্ণের গৃহে যে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করেন তাতে গোপাল উড়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রাধামোহন সরকারের মৃত্যুতে দলটিকে তিনি বাঁচিয়ে রাখেন। গোপাল উড়ে উড়িষ্যার অন্তর্গত জাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসে যাত্রাদলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় যাত্রাদলের অন্যতম সংগঠক হিসাবে তাঁর নাম স্মরণীয় হ'য়ে আছে।

সেকালে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার জনপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর। প্রায় সকলেই এই যাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।'

গোপাল উড়ের মতই বেলতলা ও আড়িয়াদহে গড়ে ওঠা দু'টি শখের যাত্রাদল সে যুগে খুব প্রশংসা লাভ করেছিল। বেলতলার প্যারীমোহনের দল 'নল দময়ন্তী' ও 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিল। আড়িয়াদহের শখের যাত্রার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী দলরূপে দক্ষিণ বরানগরে একটি শখের যাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধুসূদন ভট্টাচার্য ঐ দলে মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। শহর কলকাতায় জনপ্রিয়তা লাভের সুবাদে মফঃস্বলের নানা জায়গাতেও শখের যাত্রাদল গড়ে উঠেছিল। এই জাতীয় যাত্রাদলের মধ্যে মদন মাস্টারের যাত্রাদল অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছিল। মদন মাস্টার হুগলী কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শখের যাত্রা পরিচালনা করেছিলেন।

যাত্রা ও ইংরেজী থিয়েটারের সংমিশ্রণে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা নামক এক মিশ্র-রীতির বিনোদন শাখার আবির্ভাবও লক্ষ্য করা যায়। অধর দাসের দল পেশাদারী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। থিয়েট্রিক্যাল

যাত্রা প্রসঙ্গে নারায়ণ মাস্টারের নাম উল্লেখযোগ্য। কেননা যাত্রা পালায় তিনি প্রথম ক্লারিওনেট বাজনার প্রবর্তন করেছিলেন।

যাত্রা নাটকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষ ভূমিকায় পুরুষের অংশগ্রহণই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে যাত্রা নাটকে যখন স্ত্রী-চরিত্রে অভিনেত্রীদের প্রবেশাধিকার ঘটলো তখন এই জাতীয় যাত্রাভিনয়কে 'মেয়ে যাত্রা' নামে অভিহিত করা হলো। শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে অভিনীত 'বিদ্যাসুন্দর' বাংলা যাত্রার অভিনয়-রীতি অনুসারেই পরিচালিত হয়েছিল। তাই নবীনবসুর নাটকে মালিনী, বিদ্যার ভূমিকায় যথাক্রমে পদ্ম ও জানিবাঈয়ের অভিনয় মেয়েযাত্রার সূত্রপাত ঘটায় বললে অত্যুক্তি করা হয় না। মদন মাস্টারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নবীন যাত্রাদল চালাতে থাকেন। কিন্তু নবীনের মৃত্যুর পর নবীনের স্ত্রী যখন যাত্রাদল চালাতে এলেন তখন থেকে দলের নাম হলো 'বউ মাস্টারের দল'। বউ-মাস্টারই মহিলা হিসাবে প্রথম যাত্রাদল পরিচালনা করেন। রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের শখের যাত্রাদলের পালাগুলি যাতে উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে পারে তার জন্য রামচাঁদ অল্প বয়েসী কয়েকটি মেয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। 'ত্রৈলোক্য-তারিণীর দল' বলে একটি মেয়ে যাত্রায় মেয়েরা শুধু অভিনয় নয়, বাদ্যযন্ত্রও বাজাতেন। 'কাটা গোলাপীর দল', 'রাধারাণীর দল' ইত্যাদি নামের বহু মহিলা নিয়ন্ত্রিত যাত্রাদল বা মেয়ে যাত্রা সে যুগে যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিল। সে যুগের সংবাদপত্রে মেয়ে-যাত্রার সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল—

'আশ্চর্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।
ললিতা বিশাখা চিত্রা আর রঙ্গ দেবী।
সুদেবী চম্পকলতা এবং বিদ্যাদেবী।'

[ দ্র. সংবাদপত্রে সেকালের কথা / ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ]

যাত্রা ঐতিহ্যমূলক কাহিনীর উপর গড়ে ওঠে। তাই সামাজিক বা পারি-বারিক সমস্যা যাত্রা নাটকের দ্বিতীয় যুগেও তেমনি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তার সাক্ষাৎ ঘটে আরো পরে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতা স্পৃহায় দেশের জন্য আত্ম-বলিদানের আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বদেশী যাত্রা গড়ে ওঠে। চারণ কবি মুকুন্দদাস তাঁর স্বদেশী যাত্রার

সাহায্যে দেশবাসীর মনে স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত ক'রে তোলেন। মুকুন্দদাসের দেশাত্মবোধক যাত্রাপালার উপর বৃটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং মুকুন্দদাসকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হয়।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, দেশবিভাগের মর্মান্তিক ঘটনায় প্রভাব যাত্রা জগৎকেও প্রভাবিত করে। পেশাদরী যাত্রা দলগুলির ব্যবসাক্ষেত্র বঙ্গবিভাগের ফলে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যাত্রাশিল্পে দেখা দেয় নাভিশ্বাস। এমন সময় যাত্রা-দরদী প্রবোধবন্ধু অধিকারীর উদ্যোগে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে এক মাসব্যাপী যাত্রা উৎসবের আয়োজন করার পর যাত্রা স্বাধীন ভারতে নূতন ক'রে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত East-West Theatre Seminar and Theatre Art Festival-এ বাংলা যাত্রা পরিবেশিত হওয়ায় যাত্রা শিল্প সারা বিশ্বে শ্রদ্ধার সামগ্রী হ'য়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা শিল্পের স্বর্ণযুগ হিসাবে সত্তর দশককে চিহ্নিত করা যায়। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী প্রচেষ্টায় প্রথম যাত্রা উৎসব ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং যাত্রার উপর থেকে তদানীন্তন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় প্রমোদকর মুক্ত করা হয়।

নট্ট কোম্পানীর মত পুরাতন পেশাদারী দলের পাশাপাশি নানা নূতন দল তৈরী হলো চিৎপুরের যাত্রা পাড়ায়। ব্রজেন দে, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের মত পালাকারদের পাশাপাশি শান্তিগোপাল, তপনকুমার, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, মধুশ্রী দেবী প্রমুখের মত অভিনেতা-অভিনেত্রীর আগমনে বাংলার ঐতিহ্যাশ্রয়ী যাত্রা আবার নবরূপে সেজে উঠল।

পুরাতন পৌরাণিক ধর্মমূলক কাহিনীর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে একদিকে বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষ, লেনিন, হিটলার প্রমুখের জীবন কাহিনী নিয়ে যেমন যাত্রাপালা রচিত হলো তেমনি পঙ্কপাল, ঘর দিওনা ভেঙে, বিপন্ন বসুধা ইত্যাদির মত সামাজিক নাটক তৈরী হলো। 'হেলেন অফ্ ট্রয়'-এর মত এপিকধর্মী কাহিনী থেকেও যাত্রা পালা বঞ্চিত হলো না।

যাত্রাপালার এই সমৃদ্ধির যুগে সংবাদপত্রের যাত্রা সমালোচনা যাত্রা রসিকদের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ করতে না পারায় 'যাত্রাজগৎ', 'নাট্যলোক' ইত্যাদি যাত্রা-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো। বাংলার অনেক ঐতিহ্যাশ্রয়ী শিল্পের মত যাত্রা আর মৃতপ্রায় কিংবা পুরাতন যুগের ইতিহাস না হয় আমাদের প্রবহমানকালের ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজের আত্মপ্রকাশের পথটিকে খুঁজে পেল।

# বাংলা পৌরাণিক নাটক

সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাটক একটি জনপ্রিয় আঙ্গিক হিসাবে পৃথিবীর সব দেশেই সুপ্রাচীন কাল থেকে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। গ্রীক ও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র যথেষ্ট প্রাচীনতার পরিচয় বহন করে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নাটককে 'দৃশ্যকাব্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে। নাটক একই সঙ্গে দৃশ্য ও পাঠ্য হলেও নাটকের রসসম্ভোগ দর্শনের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। নাটক মূলতঃ অভিনীত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়। তাই নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী। কলা-কুশলী ও দর্শকমণ্ডলীকে নিয়ে গড়ে ওঠে নাট্যসমাজ।

মানব জীবনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত অবলম্বন করে নাট্যকাহিনী গড়ে ওঠে। সংলাপের সাহায্যে নাটকীয় ঘটনার মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারের ফলে নাটকে চরমোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। রসপরিণতির দিক দিয়ে নাটককে ট্রাজেডি ও কমেডি দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আবার বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করা যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুযায়ী নাটককে আবার ক্লাসিক, রোমান্টিক, বাস্তবধর্মী এবং রচনাকৌশলের দিক থেকে রূপক, প্রতীক, সাংকেতিক ইত্যাদি নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়।

পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণ ও প্রাচীন মহাকাব্য থেকে গৃহীত হয়ে থাকে। লৌকিক-অলৌকিক নানা ঘটনার সঙ্গে দেব ও মানবের এক অনায়াস সংমিশ্রণে পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমি রচিত হয়ে থাকে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ভেদ রেখা সেখানে মুছে যায়। শৌর্য-বীর্য, দয়া-ক্ষমা-করুণায় পৌরাণিক কাহিনীতে মানুষ দেবতার স্থান গ্রহণ করে, আবার দেবতাও ভক্তের আহ্বানে মর্ত্যের মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। পৌরাণিক নাটকের আবেদন যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষের চিন্তা-চেতনার কাছে নয়, তা মূলতঃ বিশ্বাসপ্রবণ ভক্তমনের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও পাপ-পুণ্যের ধারণাকে সজাগ করে রাখার জন্য প্রাচীন গ্রীক নাটকের মত বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি রচিত হয়েছিল। সমকালীন সমাজ-জীবনের কোনো সমস্যা, কিংবা পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের মিশ্রণে গড়ে

ওঠা মানবজীবনের সুখ-দুঃখ পূর্ণ মর্ত্য জীবনের ইঙ্গিত পৌরাণিক নাটকে পাওয়া যায় না। উদ্দেশ্যমূলকতা ও প্রচারধর্মিতা পৌরাণিক নাটকগুলির বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়, পাপীকে যথোচিত দণ্ড দিয়ে ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা প্রদর্শন ও ভগবানের বিপুল ক্ষমতার পরিচয় প্রদান পৌরাণিক নাটকগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি পুরাণ অথবা মহাকাব্য থেকে গৃহীত হওয়া ফলে এই চরিত্রগুলির উপরে দেবী ভাব অনায়াসেই আরোপিত হয়ে থাকে। এই জাতীয় চরিত্রের অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ধর্মভীরু ও বিশ্বাসপ্রবণ ভক্তমনে একাধারে যেমন ভক্তিরসের প্রস্রবন ঘটায় অন্যদিকে তা দেববাদে বিশ্বাস করে তোলে।

পৌরাণিক নাটকে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় যেখানে সাধারণ মানুষের মন বাস্তব জগৎ থেকে অনায়াসে এক কল্প জগতে উত্তীর্ণ হয়ে বিশেষ কোনো আদর্শ বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে থাকে। দেব চরিত্র ও অলৌকিকতা আরোপ করার জন্য পৌরাণিক নাটকে কার্য-কারণ সম্পর্কের অভাব লক্ষ্য করা যায়। দেবতা ও দেবানুগৃহীত মানব চরিত্রের প্রাধান্যের ফলে পৌরাণিক নাটকে মানব রস স্ফূর্তির ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং পক্ষান্তরে এই জাতীয় নাটকে ভক্তিরসের প্লাবন লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে। ভক্তিরস সৃষ্টির জন্য অতিলৌকিক উপাদান, অবিশ্বাস্য ঘটনা ও ধর্মীয় ভাব ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গীতের ব্যবহার বাংলা পৌরাণিক নাটকের বিশেষ রীতি হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে য়ুরোপীয় থিয়েটারের অনুকরণে নাটকাভিনয়ের শুরুতে তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'এই গ্রন্থ য়ুরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।' তারাচরণ মহাভারতের সুভদ্রা-অর্জুন উপাখ্যান অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছিলেন। আখ্যানাংশে সংগ্রহ করেছিলেন কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত থেকে। ভক্তিরসের প্রবাহের চেয়ে রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পৌরাণিক উৎস থেকে আখ্যানভাগ সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়ে 'ভদ্রার্জুন'-কে পৌরাণিক নাটক বলা যায় না।

শেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস' অবলম্বনে 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটক রচনা করে ব্যর্থ হওয়ার পর হরচন্দ্র ঘোষ অনুমান করেছিলেন যে,

স্বদেশী উপকরণ নিয়ে নাটক রচনা করলে সম্ভবত জনপ্রিয়তা অর্জন করা যাবে। তাই তিনি মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'কৌরব-বিয়োগ নাটক'। কিন্তু তাতেও তিনি নাট্যকার হিসাবে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাধ ও সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের জন্য খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন 'রুক্মিণীহরণ', 'কংসবধ', 'ধর্মবিজয়' নামক তিনটি নাটকে পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করেছিলেন। সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকে লেখা এই নাটকগুলি তেমন রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় না দিলেও তারাচরণ শিকদার কিংবা হরচন্দ্র ঘোষের চেয়ে তা অনেক পরিণত ছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে হতাশ হয়ে মাইকেল মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে  
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।  
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে,  
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।'

মহাভারতের কাহিনী থেকে গৃহীত শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির আদিরসাত্মক কাহিনীকে মধুসূদন আধুনিক যুগের রুচি ও প্রতিভা অনুযায়ী রোমান্টিক আখ্যানে পরিণত করেছিলেন। শুধু ভারতীয় পুরাণ বা মহাকাব্যকে আশ্রয় করে মধুসূদন পৌরাণিক নাটক রচনা করেননি। গ্রীক পুরাণের 'Apple of Discord'-এর কাহিনী অবলম্বনে তিনি 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করে-ছিলেন। গ্রীক পুরাণের কাহিনীকে ভারতীয় চরিত্র ও পটভূমিতে উপস্থাপন করতে গিয়ে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকে ভারতীয় পুরাণের ছদ্ম আবরণ গ্রহণ করেছিলেন। তাই গ্রীক উপাখ্যানের জুনো, প্যালাস, ভেনাস, প্যারিস ও হেলেন বাংলা আখ্যানে হয়েছে ইন্দ্রাণী, মুরলা, রতি, ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী।

তারাচরণ শিকদার থেকে শুরু করে দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত প্রায় সব বাঙালী নাট্যকার য়ুরোপীয় নাট্যরীতি অনুসরণে নাটক রচনা করতে উদ্যোগী হলেও হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা ও হিন্দুমেলার জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'ভারতবর্ষ যে য়ুরোপ নয়, য়ুরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, য়ুরোপীয় রুচি ও দেশীয়

রুচি' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি নূতন নাট্য আঙ্গিকের কথা চিন্তা করে আবেগ প্রধান, শ্লথ গতি সম্পন্ন ঘটনার সঙ্গে সংগীত বহুল নাট্যরীতির উদ্ভাবন করেন পরবর্তীকালে তা গিরিশচন্দ্রের হাতে সার্থক পৌরাণিক নাটক রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। তারাচরণ শিকদার থেকে শুরু করে মধুসূদনের নাটকে মহাকাব্য ও পৌরাণিক বিষয় স্থান পেলেও পৌরাণিক আখ্যানকে জাতীয় জীবনের রস পিপাসার সঙ্গে সংযুক্ত করে নূতন আঙ্গিকরূপে পৌরাণিক নাটক রচনার প্রয়াস সর্বপ্রথম মনোমোহন বসুর নাটকে লক্ষ্য করা যায়। মনোমোহন বসু তাঁর প্রথম নাটক 'রামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস'-এর প্রস্তাবনা অংশে যে 'নির্মল চরিত্র নায়ক-নায়িকার কথা উল্লেখ করেছিলেন তা সৃষ্টি করার জন্য তিনি পৌরাণিক কাহিনী ও পুরাণ-নির্ভর চরিত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে 'সতী', 'হরিশ্চন্দ্র নাটক', পার্থ পরাজয় নাটক,, 'রাসলীলা', 'আনন্দময়' প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। মনোমোহন বসু তাঁর নাটকে শুধু পৌরাণিক রসানুভূতি সৃষ্টি করেন নি, তার সঙ্গে হিন্দু-মেলার আদর্শ অনুযায়ী নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাবোধকেও নাটকে সংযুক্ত করে-ছিলেন। তাই তাঁর পৌরাণিক নাটক 'হরিশ্চন্দ্রে'-ও অনায়াসে তিনি 'দিনের দিন্ সবে দীন্ পরাধীন' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি যুক্ত দেশাত্মবোধক সংগীত সংযুক্ত করেন এবং 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের এই গানটি পরাধীন ভারতবর্ষে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নাট্যকার মনোমোহন বসুর প্রদর্শিত নাট্যরীতি অনুসরণে নাটক রচনা করে রাজকৃষ্ণ রায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সাবিত্রীর পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রাজকৃষ্ণের প্রথম নাট্যগীতি 'পতিব্রতা'। রাজকৃষ্ণের নাট্যগীতি বা. অপেরাধর্মী পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'নরমেধ যজ্ঞ' মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'রামের বনবাস', 'তরণীসেন বধ', 'ঋষ্যশৃঙ্গ' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। ভক্তিরসের প্রাচুর্য, হাস্যরস, অতি-নাটকীয়তা ইত্যাদি ছিল রাজকৃষ্ণ রচিত পৌরাণিক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজকৃষ্ণের লিখা নাটকগুলি সমকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও যাত্রা-নাটকের সীমা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। মনোমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায় সচেতন ভাবেই দেশীয় আঙ্গিকে দেশীয় দর্শকদের পরিতৃপ্তি প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে সচেতন ভাবে পৌরাণিক নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা

পৌরাণিক নাটকের যে বিশেষ ধারা সৃষ্টি করেন তার সামগ্রিক পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লক্ষ্য করা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে।

নট, নাট্যকার ও নাট্য শিক্ষকরূপে গিরিশ চন্দ্র যখন বাংলা নাট্যজগতে অবতীর্ণ হন তখন বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যচর্চা দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। একটি গীতোভিনয়ের ধারা আর অন্যটি হলো য়ুরোপীয় নাট্যসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠা থিয়েটারের ধারা। গিরিশচন্দ্রের যুগে য়ুরোপীয় ছাঁচে গড়ে ওঠা বাংলা নাটক উচ্চশিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙালীর মনোরঞ্জন করলেও তা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়। এই জাতীয় নাটকের সঙ্গে জাতীয় জীবন বা রস সংস্কারেরও কোন যোগাযোগ স্থাপিত না হওয়ায় এ যুগের নাটক বাঙালীর রস পিপাসা চরিতার্থ করতে সম্ভব হয়নি। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠা নব্য যুবকগোষ্ঠীর অতিরিক্ত ইংরেজীয়ানার অনুকরণের যুগ কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এ দেশে যখন জাতীয় চৈতন্যের জাগরণ ঘটে তখন দেশের আপামর জনসাধারণ নাটকের মধ্যে সেই সব প্রবুদ্ধ জীবনের বাণীতে প্রতিফলিত হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। বিশেষ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার ফলে বাঙালী যে স্বদেশ-চেতনার পরিচয় লাভ করে এবং খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম ধর্মের ভাব সংঘর্ষের আঘাত অতিক্রম করে সনাতন হিন্দুধর্ম যেভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সাহায্যে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তার ফলশ্রুতি হিসাবে জাতীয় জীবনের আদর্শকে খুঁজে পাওয়ার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা বাঙালীর মনকে চঞ্চল করে তোলে সেই আবেগ ও চাঞ্চল্যের পটভূমিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটকগুলি রচিত হয়।

পৌরাণিক নাটকের সফল স্রষ্টা গিরিশচন্দ্র ঘোষের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—গিরিশচন্দ্র ছিলেন যথার্থই বাংলার জাতীয় নাট্যকার। তিনি পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়া বাংলারই পুরাণ-কথা প্রচার করিয়াছেন। বাংলাদেশের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ সন্ধান করিতে যায় নাই।' প্রকৃত পক্ষে গিরিশচন্দ্র নূতন যুগের ভাবপ্রেরণাকে রূপায়িত করতে গিয়ে নূতন কোনো আদর্শের দ্বারস্থ হননি। বাংলার কবি কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখের কাব্য থেকে পরিচিত বিষয়বস্তু গ্রহণ করেই তিনি সেগুলি নাটকের আকারে পরিবেশন করেছেন। নাট্য-

রচনার আদর্শের দিক দিয়ে গিরিশচন্দ্র মনোমোহন বসুর ধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন বলে কোনো কোনো সমালোচক গিরিশচন্দ্রকে 'মনোমোহন বসুর ভাবশিষ্য' বলে উল্লেখ করে থাকেন। শুধু নাট্যরীতির অনুসরণ নয়, প্রথম জীবনে গিরিশচন্দ্র মনোমোহন বসুর সঙ্গে কবিগান রচনা করেছেন এবং মনোমোহন বসুর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি পৌরাণিক নাটকের ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ হন।

একদিকে নতুন যুগের প্রেরণা, অন্যদিকে মনোমোহন বসুর সাহচর্য ও বাংলার ভক্তি রসাত্মক সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ যেমন গিরিশচন্দ্রকে পৌরাণিক নাটক রচনার দিকে টেনে আনে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিরিশচন্দ্রের জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটকগুলির সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্যে এসে গিরিশচন্দ্রের মনে প্রথম অধ্যাত্মবোধ জেগে ওঠে এবং ক্রমে তা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করে। গিরিশচন্দ্র রচিত পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'রাসলীলা', 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'সীতার বিবাহ', 'সীতাহরণ', 'অভিমন্যু বধ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুব চরিত্র', 'নল-দময়ন্তী', 'কমলে কামিনী', 'শ্রীবৎ চিন্তা', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'প্রভাস যজ্ঞ', 'মহাপূজা', 'জনা', 'পাণ্ডব গৌরব', 'নন্দদুলাল' 'হরগৌরী' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'নর-নারায়ণ' ও 'ভীষ্ম' নাটকের নাম পৌরাণিক নাটক হিসাবে সুপরিচিত। 'নর-নারায়ণ' নাটকের প্রস্তাবিত নাম ছিল 'কর্ণ'। এই নাটকটিতে তিনি কর্ণ-চরিত্রকে নূতনভাবে উপস্থাপিত করতে চেয়ে বলেছিলেন—'কর্ণ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, সেইটাই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা।' কিন্তু 'নর-নারায়ণ' নাটকে কর্ণকে 'দৈব নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর' রূপে প্রকাশ করার বাসনা সার্থক হয়নি। তার পরিবর্তে নাটকটিতে প্রবল কৃষ্ণভক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে এবং এই প্রবল কৃষ্ণভক্তির জোয়ারে কর্ণ চরিত্র দূরে ভেসে গিয়েছে। 'ভীষ্ম' নাটকেও তিনি ভীষ্মের মানবিক মহিমাকে প্রাধান্য দিতে চাইলেও সে প্রয়াস সার্থক হয়নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল মূলতঃ ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করলেও 'পাষাণী', 'সীতা' ও 'ভীষ্ম' নামক তিনটি পৌরাণিক নাটক তিনি রচনা

করেছিলেন। 'সীতা' নাট্যকাব্যটি দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার পরিচয় বহন করে। রামায়ণের পুরাতন কাহিনীকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে একত্রিত করে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতায় নাটকটিকে তিনি নূতন আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। নূতন যুগের প্রাণস্পন্দনকে কী ভাবে নূতন যুগের মূল্যবোধ ও শিল্পকলার আদর্শে পরিণতি দান করা যায় 'সীতা' নাটকে তিনি তার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মহাভারতের আখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নাট্যকাব্য রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথের নাটকে বৌদ্ধপুরাণ অধিকতর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাঁর 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা', 'মালিনী', 'রাজা', 'অরূপরতন', 'শাপমোচন' ইত্যাদি নাটক ও নৃত্যনাট্যে বৌদ্ধপুরাণ ও বৌদ্ধ-যুগের সমাজ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্ররচিত এ জাতীয় নাটকের মধ্যে 'মালিনী' নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। 'মালিনী' নাটকের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে বৌদ্ধ 'মহাবস্তু' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মালিন্যাবস্তু' র আখ্যানাংশকে অবলম্বন করে রচিত এবং গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত ট্রেভেলিয়ান এই নাটকটিতে গ্রীক নাট্যাদর্শের প্রতিরূপ লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মালিনীর নাট্যরূপ সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।'

রবীন্দ্রোত্তর যুগে পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে বুদ্ধদেব বসু 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'প্রথম পার্থ', 'কাল সন্ধ্যা' ইত্যাদি কাব্যনাট্য রচনা করেছেন।

মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর', 'দেবাসুর', 'কারাগার', 'সাবিত্রী', 'খণা', 'রাজপুরী' ইত্যাদি নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

য়ুরোপীয় নাটকের ধারা অনুসরণে বাংলা নাটক রচনার প্রথম যুগে পৌরাণিক নাটক নূতন আঙ্গিকের প্রয়োজনে গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র তাঁকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার অভিপ্রায়ে বাঙালীর সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে পৌরাণিক নাটককে যুক্ত করে একটা নূতন মাত্রা তাতে সংযোজন করেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তুর রামায়ণ-মহাভারতের গতানুগতিক ধারা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ ও বৌদ্ধ সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়ে তাঁর নাট্য প্রতিভার ঐশ্বর্য ও ঔজ্জ্বল্যে বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারাকে একটা পরিণতি দান করতে সক্ষম হয়েছেন।

# সামাজিক সমস্যাশ্রয়ী বাংলা নাটক

য়ুরোপীয় থিয়েটারের অনুসরণে অবসর বিনোদনের দিকে লক্ষ্য রেখে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটকের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ ঘটলেও প্রথমদিকে তা সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদ কিংবা পৌরাণিক ভক্তিরসাশ্রয়ী নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালীর জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা নাটকের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

উনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার নবজাগৃতির যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বাঙালীর সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক জীবনে এ শতাব্দীতে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল আন্দোলনকে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতে লক্ষ্য করা যায়। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর নব্য-শিক্ষিত আধুনিক যুবকের আত্মপ্রকাশ যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তার পাশাপাশি পুরাতন পন্থী রক্ষণশীল হিন্দুদের চিন্তাধারাকেও ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এ যুগে একদিকে যেমন পুরাতন আচার ও সংস্কারগুলিকে আঁকড়ে থাকার প্রাণপণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তার পাশাপাশি পুরাতন যুগের জীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য চিন্ত-চেতনাকে বিসর্জন দিয়ে নূতন বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমাজ জীবনে সমস্যা যত প্রবল হয়ে ওঠে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে উপকরণের প্রাচুর্যও তেমনি লক্ষ্য করা যায়। তাই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের প্রেক্ষাপটে সমস্যামূলক নাট্যরচনার সুযোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে পূর্ণাঙ্গ নাটক—ট্রাজেডি ও কমেডি ছাড়াও প্রহসন ও নক্সাজাতীয় নাটকের আঙ্গিকও বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যভাবনায় নূতন আঙ্গিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

সমস্যামূলক নাটককে মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—১. বৃহত্তর সামাজিক সমস্যামূলক নাটক ও ২. ক্ষুদ্র পারিবারিক সমস্যামূলক নাটক। যে নাটকে সমাজশক্তির সংঘর্ষে নাটকীয় কাহিনীর পরিণতি ঘটে এবং নাটকের সঙ্গে সংযুক্ত চরিত্রগুলির উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায় তাকেই আমরা সামাজিক নাটক বলে থাকি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিবার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও সমাজ ও পরিবারের সমস্যা এক জাতীয় নয়। পারিবারিক

সমস্যায় পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই জর্জরিত হয়, বৃহত্তর সমাজে এই সমস্যা তেমন কোন প্রভাব নাও বিস্তার করতে পারে। কিন্তু সামাজিক সমস্যার রূপ এত বৃহৎ এবং ব্যাপক যে তার প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের আত্মরক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। পারিবারিক সমস্যার গণ্ডী নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ কিন্তু সামাজিক সমস্যার পরিধি সুদূর বিস্তৃত। পরিবার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও সমস্যাশ্রয়ী নাটকের ক্ষেত্রে নাটকের ফলশ্রুতিতে পরিবার অথবা সমাজের দুয়ের মধ্যে কার উপরে ক্ষতির পরিমাণ অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে সেই মানদণ্ডেই সমস্যাশ্রয়ী নাটককে পারিবারিক ও সামাজিক বিশেষ কোনো একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

অনেকে বলে থাকেন বাঙালী জীবনে নাটকীয়তার অভাব বলেই বাংলায় যথার্থ নাটক রচিত হয় না। কিন্তু একথা সত্য নয়। বাঙালী জীবনে যেমন হাজার সমস্যা আছে বাঙালী তেমনি সেই সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করে আত্মরক্ষার পথ অনুসন্ধান করতে জানে বলেই বাঙালী তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। বাঙালীর জীবন-যাত্রার এই বলিষ্ঠ সংগ্রামী জীবন চেতনার পরিচয় এবং জাতীয় জীবনের নানা সমস্যার প্রতিফলন বাংলা নাটকে যতখানি ধরা পড়েছে অন্য কোনো আঙ্গিকে তার চিত্র ততখানি সুস্পষ্ট নয়।

ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের প্রথম যুগেই সামাজিক কুসংস্কারগুলি আমাদের চোখে যেভাবে ধরা পড়ে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে বাঙালী নাট্যকারেরাই এগিয়ে এসেছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' তারই ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে রংপুর-কুণ্ডীর পরগণায় জমিদার 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নামক নাটক রচনা করার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন পুরস্কৃত হন। উল্লেখযোগ্য যে, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উদ্যোক্তারা অভিনয় উপযোগী নাটকের অভাব লক্ষ্য করে 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তার বিষয় বস্তু কৌলীন্য প্রথার মত সামাজিক সমস্যার মতই সমাজদেহে ক্ষত সৃষ্টিকারী 'বহুবিবাহ' 'হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা', 'পল্লীগ্রামে জমিদারদের অত্যাচার' ইত্যাদি নানা সমাজ-সচেতন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল। মূলতঃ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটকের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকে যে সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় তার পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায় রামনারায়ণের জোড়াসাঁকো নাট্যশালার

আহ্বানে রচিত 'বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক'-এ। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা বহুবিবাহ বিষয় ছাড়া আরো যে ছুটি নাট্য বিষয়ের জন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন তার অন্ততম বিষয় ছিল হিন্দু মহিলাগণের বর্তমান দুরবস্থা'। এ সম্পর্কে 'হিন্দু মহিলা নাটক' রচনা করে সোমড়া-নিবাসী বিপিন মোহন সেনগুপ্ত পুরস্কার লাভ করলেও নাটকটি জোড়াসাঁকো রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ, পণপ্রথা, মত্তপান ও নৈতিক ব্যভিচার, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি উনবিংশ শতাব্দীর সমস্যাশ্রয়ী বাংলা নাটকের প্রধান উপকরণ হিসাবে গৃহীত হয়। কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের ক্রটিকর দিক নির্দেশ ক'রে দীনবন্ধু মিত্র 'জামাই বারিক' নাটক রচনা রচনা করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বাঙালী সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের সমর্থনে সে যুগের প্রগতিশীল মানুষেরা যেভাবে জনমত তৈরী করার চেষ্টা করেন তেমনি রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্র রূপে রাজা রাধাকান্ত দেব ও সে যুগের অন্যান্ত বিশিষ্ট বাঙালীরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করায় বাঙালী সমাজে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে রচিত সর্বপ্রথম নাটক উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক। পরবর্তীকালে একই বিষয় নিয়ে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় 'চপলা-চিত্ত-চাঞ্চল্য, নামক একটি নাটক রচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত একজন মুসলমান শিমুয়েল পীরবক্স হিন্দু সমাজের বিধবাবিবাহ সমস্যা নিয়ে 'বিধবা-বিরহ' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা ক'রে গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচনা করেছিলেন 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকটি।

পরিণত বয়সে বিবাহ যুক্তিসঙ্গত বলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পরিণত বয়সে বিবাহ স্বীকৃত প্রথা। বাল্যবিবাহ প্রথা আদিবাসী সমাজে পর্যন্ত নয়। কেবল মাত্র কৌলীন্য প্রথার কুফল হিসাবে উচ্চতর হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজেও এই প্রথার প্রভাব দেখা যায়। নানাভাবে বহু বালিকাবধুকে বাল্যবিবাহের কুফলের জন্য নির্যাতিত এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথা বাঙালী হিন্দু

সমাজে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ায় তার প্রতিরোধ অপরিহার্য ওঠে। একদিক এই শতাব্দীর মননশীল ব্যক্তিরা যুক্তিবাদী চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে এই প্রথার বিরুদ্ধে যেমন মতামত প্রকাশ করতে থাকেন তেমনি সমাজ সংস্কার ও নারীকল্যান কামনায় ব্রতী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রয়াসে দেশব্যাপী বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদের সমর্থনে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সমসাময়িক কালে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে এই সামাজিক সমস্যাটিকে অবলম্বন ক'রে সে যুগে বহু বাংলা নাটক রচিত হ'য়েছিল। এই জাতীয় নাটকগুলির মধ্যে শ্যামাচরণ শ্রীমানী রচিত 'বাল্যোদ্বিবাহ' নাটকটির নাম উল্লেখযোগ্য। শুধু বাল্যবিবাহ নয়, অসম পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহের কুফল অবলম্বনে দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেছিলেন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকটি। বৃদ্ধের ব্যাভিচার প্রবণতাকে নিন্দা ক'রে মধুসূদন রচনা করেছিলেন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' প্রহসনখানি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশে ইংরেজদের আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহারের অনুকরণ একশ্রেণীর মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। অপরিমিত মদ্যপান, বাঈজী ও বারবণিতা সংসর্গ সমাজ পরিবেশকে দূষিত ক'রে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতার নগর জীবনে এ জাতীয় স্খলন ও পতন কতখানি ক্ষতিকারক ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই সমস্যাগুলি নিয়ে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী নাটকে। মদ্যপানের কুফল পারিবারিক জীবনে কতখানি বিপর্যয় এনে দিতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে গিরিশচন্দ্র 'প্রফুল্ল' নাটক রচনা করেছিলেন।

নৈতিক ব্যাভিচারের সমস্যা নিয়ে যে সমস্ত নাটক রচিত হ'য়েছিল তার মধ্যে প্রসন্নকুমার পালের 'বৈশ্যাসক্তি নিবর্তক নাটক', রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'চক্ষুদান', বিপিন বিহারী দে রচিত 'একাদশীর পারণ' ইত্যাদি প্রহসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক সমস্যামূলক নাটকগুলি প্রধানত সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদির প্রতি আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে লিখিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যা আর শুধুমাত্র সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে রাজনীতি ও অর্থনীতি কেন্দ্রিক হ'য়ে উঠলো। পরবর্তীকালে তা যুদ্ধ-দাঙ্গা, মারী-মন্বন্তর, দেশবিভাগ ও বাস্তহারা

সমস্যা ইত্যাদিকে অবলম্বন ক'রে রচিত হলো সমস্যাশ্রয়ী বাংলা নাটক।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দু'টি ঘটনা হলো সিপাহীবিদ্রোহ ও নীলবিদ্রোহ। সিপাহীবিদ্রোহ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারলেও নীলবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল। নীলবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পন' নাটকের নাম অত্যন্ত সুপরিচিত। 'নীলদর্পন' নাটকের ঘটনা গোলক বসুর পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হলেও এই নাটকটিতে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যাকেই তুলে ধরা হ'য়েছে।

হিন্দুমেলার আদর্শে বাঙালীর মনে যে স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ ঘটে তার পরিচয়ও সমকালীন বাংলা নাটকে পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী', শরৎ-সরোজিনী' নাটক দুটির নাম উল্লেখযোগ্য। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' মূলত রোমান্টিক প্রণয়মূলক নাটক হওয়া সত্বেও নাটকটিতে ম্যাজিস্ট্রেট্ ম্যাক্রেণ্ডেলের দুশ্চরিত্রতা ও অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী যুক্ত হওয়ায় সরকারী নির্দেশে নাটকটির অভিনয় বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং নাট্যকার স্বয়ং এবং অভিনেতা অমৃতলাল বসু উভয়ে একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকটি সে যুগের সংবাদপত্রে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা লাভ করে। 'নীলদর্পন' ছাড়া অন্যকোনো নাটক এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত উপেন্দ্রনাথ দাসের 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' যা পরে 'হনুমান-চরিত্র' নামে অভিনীত হয় তাকে কেন্দ্র করে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের কথা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে আছে।

তারপর এলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উদ্দীপণা দুই বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মারী-মন্বন্তর ও দেশবিভাগের মত নানা মর্মস্পর্শী ঘটনা। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশাত্মবোধ ঐতিহাসিক নাটক রচিত হলেও সমস্যাশ্রয়ী নাটক রচিত হয়নি।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মারী-মন্বন্তর, দেশবিভাগের মত ঘটনা নিয়ে রচিত নাটকগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমস্যার রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। দুর্ভিক্ষ ও মারী-মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' প্রভৃতি নাটক।

জোতদার-কৃষকের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শোষণের আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরঙ্গ' ও তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটকে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও তার সঙ্গে দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে রচিত নাটকগুলির মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা', 'জীবনস্রোত', তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি', সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি' ইত্যাদির কথা উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছিল দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মশাল' এবং চীন ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একই নাট্যকারের লেখা নাটক 'সীমান্তের ডাক'।

তবে একথা উল্লেখযোগ্য যে, নাটকের উদ্দেশ্য শুধু যুগোচিত ভাব পরিবেশন করা নয়। তাকে চিরন্তন সাহিত্যের দাবীকেও স্বীকার করতে হয়। সমস্যাশ্রয়ী নাটক রচনা করতে গিয়ে দুর্বল নাট্যকারের হাতে তা উদ্দেশ্যমূলকতায় পরিণত হয়। নাটক যে কোনো সামাজিক সমস্যার কথাই প্রচার করুক না কেন তার প্রাথমিক শর্ত হলো তাকে নাটক হ'য়ে উঠতে হবে। সেদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে বলা চলে, বাংলা সমস্যাশ্রয়ী নাটকগুলি যুগের দাবীকে পূর্ণ করেও তা চিরন্তন অনুভূতিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

এ ছাড়া লক্ষণীয় বিষয় হলো, সমস্যাশ্রয়ী বাংলা নাটকগুলি যুগগত প্রেরণার ফলে রচিত হওয়ায় তা আমাদের দেশ-কালের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল চিত্র রূপে মর্যাদালাভের অধিকারী হ'য়ে উঠেছে।

মানব জীবনে সমস্যার অন্ত নেই, বাঙালীর সমাজ-জীবনও সমস্যামুক্ত নয়—তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারও সামাজিক সমস্যাশ্রয়ী নাটকে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

# বাংলা উপন্যাসে স্বদেশচিন্তা

সাহিত্য যে যুগেই রচিত হোক না কেন তার মধ্যে দেশকালের পটে বিধৃত সামাজিক পটভূমিকা অবশ্যই লক্ষ্য গোচর হয়ে থাকে। স্বদেশ ও স্ব-সমাজকে অবলম্বন করেই তা গড়ে ওঠে। উনসিংশ শতাব্দীতে বাংলার রেনেসাঁসের ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজে যে স্বদেশচিন্তার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় বাংলা কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজীবনীর মত বাংলা উপন্যাসেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষে বাঙালীর মনে যে স্বদেশ-চিন্তা ও জাতীয়তাবোধ ছিল জাতির শৃঙ্খলমুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, স্বাধীনোত্তর কালে তা ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। অধুনা বিস্মৃত বাঙালীর সেই ইতিহাস স্বদেশচিন্তামূলক উপন্যাসগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগ্রত স্বদেশচিন্তার মূলে ছিল ইংরেজী শিক্ষা। মহাত্মা, ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায়ের ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ ক'রে বলা যায় যে, এদেশে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের আগেই এমন একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা লাভ ক'রে হিন্দুধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে-ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রগোষ্ঠী ডিরোজিওর নেতৃত্বে দেশপ্রেমের মূলমন্ত্র উচ্চারণ করেন। স্বাধীনভাবে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই প্রেরণা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নানা সভা সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি', 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোশিয়েশন' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর দুটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ। নানা কারণে সংঘটিত বিদ্রোহ ও দুর্ভিক্ষাদির মত ঘটনায় এই শতাব্দীতে ইঙ্গ-বঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের মনে নানা কারণে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধ দানা বেঁধে ওঠে। এই দুঃখ ও হতাশাবোধ অন্যের মনে সঞ্চারিত করা, আত্মবিকাশের জন্য নূতন পথের সন্ধান এবং রাজনৈতিক আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে ওঠায় জনমত সৃষ্টির জন্য এই শতাব্দীতে জাতীয় মেলা, প্রদর্শনী, নৃত্য-গীতে ইত্যাদির ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে

ওঠে। জাতীয়তাবোধের এই উন্মেষের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়।

পরাধীনতার বেদনা বাঙালী জাতিকে স্বাদেশিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। দেশের সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে এই জন্মগত অনুভূতিটি যেমন বাহ্যিক রাজনৈতিক আঘাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনি দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মনেও তার রেখাপাত লক্ষ্য করা যায়। তাই বাঙালীর স্বাদেশিকতা-বোধের ক্ষেত্রে দু'টি স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়—১. স্বতঃস্ফূর্ত ও জন্মগত স্বাদেশিকতাবোধ, ২. নবজাগৃতির আলোকে গড়ে ওঠা য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠা স্বাদেশিকতাবোধ।

প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন রামনিধি গুপ্ত ( নিধু বাবু ) ও ঈশ্বর গুপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণা-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও সাহিত্যে অতীতের স্বপ্নময় সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যতের অদৃশ্য সুখ ও সম্পদের চিত্র একত্রিত হয়ে স্বাদেশিকতাবোধকে যেভাবে জাগ্রত করে তুলেছিল তা থেকে বাংলা উপন্যাস বঞ্চিত হয়নি। ভারতবর্ষে সনাতন অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে শৌর্য-বীর্য, ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ ইত্যাদি উপকরণে এই শতাব্দীতে বাঙালীর মনে যেভাবে হিন্দু জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতা মিশ্রিত হয়ে পড়ে তার প্রভাবেই রচিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত ঘটে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার। পরবর্তীকালে তা আরো বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব থেকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেলেও বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙালীর স্বদেশচিন্তাকে সাহিত্যের আধারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনায় স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠতা ও আবেগধর্মিতাকে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। তিনি মূলতঃ মিলনধর্মী, সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বদেশচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের জীবন চরিত রচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন—'দেশবাৎসল্য পরমধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাংলাদেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না বলিতে পারি

না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশ বাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাংলাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।' বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির নাম দেশ বাৎসল্যের সঙ্গে যুক্ত ক'রে বাঙালীর স্বদেশচিন্তা বা দেশবাৎসল্যের সংজ্ঞাকে অনেকখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা 'বাংলাদেশের সুখ-সমৃদ্ধির ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার দাবী এখানে যতখানি স্বীকৃত ভারতের দাবী ততখানি স্বীকৃত নয়।' কিন্তু একথা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ বলতে কেবল বাঙলাকে বোঝেন নি, তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র ভারতবর্ষই স্বদেশভূমি। বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেও ভারতবর্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় একেবারে প্রভাব বিস্তার করেনি এমন কথা বলা চলে না। বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' ইত্যাদি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইংরেজ শাসন এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসীদের মনে এক জাতীয়ত্বের ধারণা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজ শাসন-পূর্ব ভারত ইতিহাস অবলম্বনে যে উপন্যাস রচনা করেছেন স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র উপস্থাপিত হয়নি। সে জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতি গড়ে তোলার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন এমন কথাও বলা চলে না। তিনি তাঁর বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনায় স্পষ্টই বলেছে—'এমন অনেক কথা আছে তাহা কেবল বাঙালীর জন্য নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় নানা জাতি, একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীত্বকে ভারতীয়ত্বের সোপান বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বাঙালীত্বকে উপলব্ধি করতে পারলে বাঙালীর পক্ষে ভারতীয়ত্বের স্বরূপ সন্ধান সহজ হবে। তাই তিনি মূলের উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ' ( চতুর্থ সংস্করণ ) প্রভৃতি উপন্যাসে যে স্বদেশচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তাঁর সামগ্রিক জীবন দৃষ্টিতে স্বদেশকে তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর স্বদেশচিন্তামূলক উপন্যাসে যেমন তার প্রতিফলন ঘটেছে তেমনি তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাদির মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আমার দুর্গোৎসব', 'একটি গীত', 'বাঙালীর ইতিহাস', 'বাঙালীর কলঙ্ক' প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস চেতনাহীন বাঙালীকে পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাঙালীকে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'মৃণালিনী' থেকে শুরু করে 'সীতারাম' পর্যন্ত উপন্যাসে বাঙালী ও বাংলার কথা প্রাধান্য পেলেও 'রাজসিংহ' চতুর্থ সংস্করণে তিনি ভারতীয়বোধকেই জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মত বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাসে ইংরেজ শাসকের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজ জাতির প্রশংসা করতেও বিরত থাকেন নি। বিশেষভাবে বাঙালীর স্বদেশ-চিন্তার পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে যাহা আমরা আগে জানিতাম না।' বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি মিলনধর্মী ও সমন্বয়বাদী বলেই তিনি এমন কথা অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন। তাই তিনি 'জাতিধের' প্রবন্ধে এই মিলনধর্মী স্বাদেশিকতার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন—

'জাতিধের স্পৃহনীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহনীয় নহে। দ্বেষ মনের অতি কুৎসিত অবস্থা, যাহার মনে স্থান পায় তাহার চরিত্র কলুষিত করে। বাঙালী ইংরেজের প্রতি বিরক্ত থাকুন কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন।' অকারণ ইংরেজ-বিরোধিতা নয়, ইতিহাস চেতনাহীন বাঙালীকে পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাঙালীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল। তিনি তাঁর প্রবন্ধাবলী ও স্বদেশচিন্তামূলক উপন্যাসগুলির সাহায্যে সেই দায়িত্বটুকু পালন করতে চেয়েছিলেন।

ইতিহাসের পটভূমিকে আশ্রয় করে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত স্বদেশচিন্তামূলক উপন্যাস করেছিলেন সেগুলির মধ্যে একটি চিন্তাগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন যে, স্বদেশ ও স্ব-সমাজের দায়িত্ব যাঁর হাতে অর্পিত হবে তাঁর চরিত্র যদি অনুশীলিত না হয় তাহলে ঐ চরিত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আদর্শ ভেঙে পড়তে বাধ্য। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের হেমচন্দ্র-পশুপতি ব্যক্তিগত ভোগসুখের জন্য কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিতে পারেননি বলেই স্বদেশবোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত হিন্দুরাজ্য রক্ষা করতে পারেননি। 'আনন্দমঠে' ভবানন্দ সন্তানধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে কল্যাণীর পাণিপ্রার্থীরূপে উপস্থিত হয়েছে, 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে প্রফুল্ল নিষ্কামধর্মে দীক্ষিতা হয়েও স্বামী সম্পর্কিত দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে না পারার জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মত গুরু দায়িত্ব তার পক্ষে পালন করা সম্ভব হয়নি। নানা সদগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও 'সীতারাম' উপন্যাসের নায়ক সীতারাম ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার সর্বগ্রাসী লেলিহ শিখা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসের 'রাজসিংহ' চরিত্রের মধ্যে সর্বগুণান্বিত আদর্শ নায়কের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিলেন।

তাই এই চরিত্রটির মাধ্যমে তিনি স্বদেশপ্রেমিক যোগ্যবীর ও নেতার দৃষ্টান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে স্বদেশের শৌর্য, বীর্য ও ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত দিয়ে স্বদেশচিন্তামূলক উপন্যাসের যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্কিম-সমসাময়িক ঔপন্যাসিকেরা সেই রীতিকে আশ্রয় করেই অনুরূপ উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বঙ্কিম-সমকালীন ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেনের ঔপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠতা ও স্বদেশচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তুর জন্য বেছে নিয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়কালে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা। যার ফলে চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাসগুলিতে স্বাধীনতা-প্রিয় ভারতীয় ভূস্বামী, দেশীয় রাজা ও শাসনকর্তাদের সঙ্গে ইংরেজ বণিক শক্তির বিরোধ ও সংঘাতে চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'মহারাজ নন্দকুমার' অথবা 'শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝান্সীর রানী', 'এই কি রামের অযোধ্যা' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে লিখিত স্বদেশচিন্তামূলক উপন্যাসের মধ্যে

রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'-র নাম উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতাপ সিংহ', হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষবীর', 'মন্ত্রের সাধন' স্বর্ণকুমারীদেবীর 'দীপনির্বাণ', 'মিবাররাজ', 'বিদ্রোহ' ইত্যাদি উপন্যাসেও প্রাচীন ভারতের গৌরব স্মৃতির সাহায্যে জাতীয় জীবনে স্বাধীনতাস্পৃহা ও স্বাদেশিকতাবোধ জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

বঙ্কিম পরবর্তী ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে যুগের ধর্ম ও রাজনীতি দু'টি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল। একটি হলো চরমপন্থী অন্যটি নরমপন্থী। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন এই দু'টি ধারার কোনোটিকেই প্রশ্রয় দেননি। শতাব্দীর সূচনায় রামমোহনের প্রচেষ্টায় যে বৈদান্তিক ও ঔপনিষদিক চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসিকতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনো ধর্মীয় বা রাষ্ট্রনৈতিক মত অবলম্বন করে কখনো অন্যকে আঘাত করেন নি। তাঁর আবেদন ছিল মানুষের হৃদয়ের কাছে। দেশকাল ও ধর্মের উর্ধ্বে সহজাত শাশ্বত মূল্যবোধের গভীরে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা প্রত্যক্ষত গড়ে উঠেছিল পিতা এবং পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে। কৈশোরে তিনি অগ্রজদের সঙ্গে হিন্দুমেলায় যেতেন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি 'হিন্দুমেলার উপহার' পাঠ করেন। তখনও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি 'বন্দেমাতরম্', 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' প্রভৃতি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'সিডিশন বিল', 'য়ুনিভার্সিটি বিল', 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব', 'শিবাজী উৎসব' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ইত্যাদি সমকালীন নানা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নরমপন্থীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ, আবার চরমপন্থীদের রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে ডাকাতি, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তিনি বিরোধিতা করেছেন। এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তামূলক উপন্যাসগুলি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ তার 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে স্বদেশ সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় দিলেও

পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তিনি সমকালীন ঘটনাকেই স্থান দিয়েছিলেন। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' উপন্যাস তিনটিতে এই সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে ভালোবেসেছিলেন গভীরভাবে তবে দেশ বলতে তিনি কোনো ভৌগোলিক গণ্ডীকে স্বীকার করেন নি। সে দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে সারা বিশ্বই ছিল তাঁর জীবন সাধনার পুণ্যভূমি। রবীন্দ্রনাথের এই প্রসারিত জীবন চেতনার পরিচয় আছে 'গোরা' উপন্যাসে। 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বাংলার বিপ্লববাদের প্রতি বীতস্পৃহা প্রকাশিত হলেও বাংলার অন্যতম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের রচনায় তা গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বদেশ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হ'তে দেখা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে যেমন শ্রমিকের দাবী সমর্থিত হয়েছে তেমনি তাঁর 'দেন -পাওনা' উপন্যাসে কৃষকের অধিকারকেও স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে শ্রমিক কৃষকের দাবী উত্থিত হওয়ায় তাঁকে শুধু স্বদেশ-সচেতন ঔপন্যাসিক বলে নয়, গণসচেতন ঔপন্যাসিক হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়।

রবীন্দ্র শরৎ সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারাশঙ্করের 'চৈতালী ঘূর্ণি' 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতি উপন্যাসে স্বদেশচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম মূলতঃ কবি হলেও তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা' উপন্যাস দুটিতে তীব্র স্বদেশ প্রেমের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীকালে রুশবিপ্লবের সাফল্য, কম্যুনিস্ট ইণ্টার ন্যাশন্যাল, লেনিনের কলোনিয়াল থিসিস্, ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন, গান্ধীবাদী চিন্তার পাশাপাশি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নূতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাসের স্বদেশচিন্তা ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলে। সেই পরিবর্তমান চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন', ধূর্জটি প্রসাদের 'অন্তঃশীলা, 'আবর্ত', 'মোহনা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন্ত্রমুখর', 'মহানন্দা', 'স্বর্ণসীতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিবিম্ব', নরেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' মনোজ বসুর 'ভুলি নাই', '৪২',

'বাঁশের কেল্লা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', সরোজ রায়চৌধুরীর 'কৃশানু' প্রভৃতি উপন্যাসে।

দেশের পরাধীনতার জন্য দুঃখবেদনা ও অপমানবোধ থেকে মুক্তির কথা চিন্তা ক'রে একদা বাঙালী ঔপন্যাসিকেরা অতীত ইতিহাসের শৌর্য-বীর্যময় কাহিনীগুলির সাহায্যে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাঙালীর স্বদেশচিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করার যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তা সমকালীন যুগের অহিংস-সহিংস আন্দোলন থেকে শুরু করে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের মধ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছে। গান্ধীবাদ-সুভাষবাদকে অতিক্রম ক'রে বাংলা উপন্যাস মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ায় বাংলা স্বদেশ-সচেতন উপন্যাসে দেশাত্মবোধের উর্ধ্বে আন্তর্জাতিকতাবোধ প্রাধান্য লাভ করে।

# বাংলা কবিতায় স্বদেশ প্রেম

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ মানব-জীবনের এক স্বাভাবিক প্রবণতা। পরদেশের তুলনায় স্বদেশের সাহিত্য-শিল্পকলা-সংস্কৃতিচেতনার বিশিষ্টতা এবং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যচিন্তা ও স্বদেশের উপর পর রাজ্যের আক্রমণ বা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মনে স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ ঘটে।

ভারতবর্ষে এই জাতীয় স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ উনিশ শতকে ইংরেজ জাতি ও তার সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসক-শক্তির সঙ্গে সংঘাতের ফলে তা ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে। মূলতঃ পরাধীনতাবোধ থেকেই বাঙালীর মনে স্বদেশ প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে। এই স্বদেশ-প্রীতি একদিকে যেমন দেশের সাধারণ মানুষকে ব্যাকুল করে তোলে তেমনি দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষের মনেও তা নূতন আবেগ সৃষ্টি করে।

বাংলা কাব্যে যে স্বদেশ প্রেম লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত মানুষের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেমের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি সমকালীন যুগের শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ বিশেষতঃ নবজাগৃতির আলোকে আলোকিত নব্যবঙ্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত স্বদেশপ্রেমের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা কাব্যে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত হিসাবে রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু ) ও ঈশ্বরগুপ্তের নাম উল্লেখ করা যায়। রামনিধি গুপ্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া থানার অধীনস্থ চাপ্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। টপ্পা গানের প্রবাদ-পুরুষ হিসাবে নিধুবাবু জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তাঁর রচনায় অস্ফুট ভঙ্গীতে স্বদেশ প্রেমের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন—

'নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা ?'

প্রবোধচন্দ্র সেনের ভাষায়—'নিধুবাবুর এই অস্ফুটচেতন জিজ্ঞাসা ও আকুতি পরের যুগে পূর্ণমূর্তি পেয়েছে ঈশ্বরগুপ্তের মাতৃভাষার মত কবিতায়।'

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া গেলেও তা নিয়ে বিদগ্ধ মহলে নানা মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। কোনো-কোনো সমালোচক বলে থাকেন ঈশ্বরগুপ্তে 'স্বদেশ' কবিতায় যে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিচার-বুদ্ধিহীন সংকীর্ণ স্বদেশচিন্তার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া যিনি ইংরেজ জাতির পরম মিত্র এবং ইংরেজদের শৌর্য-বীর্যে ও যুদ্ধ জয়ে মুগ্ধ তাঁর কবিতার মধ্যে যে দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তা কতখানি আন্তরিক এবং অকৃত্রিম সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তবু একথা উল্লেখযোগ্য যে, ঈশ্বরগুপ্ত মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই জনসাধারণের মনে দেশপ্রীতিকে জাগ্রত ক'রে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাই ঈশ্বরগুপ্তের জীবন ও কবিত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'স্থূল কথা তাঁর কবিতা অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই।'

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় স্বদেশ প্রেম ও ইংরেজ প্রেমের যে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় তার জন্য ঈশ্বরগুপ্তকে ঠিক দায়ী করা যায় না। তার জন্য দায়ী যুগ-মানস। উনিশ শতকে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে এদেশের মানুষের মনে যে দেশপ্রেম জেগে ওঠে তা কখনোই ইংরেজ জাতির সঙ্গে সংঘর্ষের পথ বরণ করে নিতে চায় নি। ইংরেজ জাতির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সে যুগের বহু চিন্তাশীল মানুষ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তও সেই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি। তাই বাংলা কাব্যে ঈশ্বরগুপ্ত যে স্বদেশচিন্তার উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন তাকে শুধু নঞর্থক দিক দিয়ে ছোট করে দেখলে চলে না। বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য যে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর 'ভারতের ভাগ্য বিপ্লব', 'স্বদেশ' কবিতায় সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে দেশজননীর মর্যাদা দিয়ে বলেছিলেন—

'জান না জীব তুমি
জননী জন্মভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে
সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে স্বদেশপ্রেমের পূর্ণ প্রকাশ তার প্রথম উচ্ছ্বাস ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় লক্ষ্য গোচর হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলা কাব্যে নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রেমের পথ-প্রদর্শক হিসাবে ঈশ্বরগুপ্তের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

নিধুবাবু ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় স্বদেশীভাষা, জন্মভূমি ইত্যাদি অবলম্বনে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া গেলেও পরাধীনতার জন্য আন্তরিক বেদনা ও তীব্র দেশাত্মবোধ সেখানে অনুপস্থিত ছিল। বাংলা কাব্যে সেই আবেগ ও উন্মাদনা সঞ্চারের প্রথম পথ-প্রদর্শক হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রঙ্গলাল প্রখর ইতিহাস চেতনা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে যে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তা ইতিহাস চেতনারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের পরিকল্পনার মধ্যে এই ইতিহাস সচেতন স্বদেশপ্রীতির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। 'ক্ষত্রিয়ের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য' অংশে লিখিত—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে,
স্বর্গ সুখ তায়॥—ইত্যাদি

স্বদেশপ্রেমিক বাঙালীর মুখে Epigram-এর মর্যাদা লাভ করেছে। শুধু 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নয়, 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চী-কাবেরী' প্রভৃতি কাব্যে স্বদেশ প্রেমের উদ্বর্তন লক্ষ্য করা যায়।

নবজাগরণের যুগে বাংলা কাব্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত কবিতায়। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নানা স্থানে স্বদেশের জন্য আনন্দ-বেদনা ও বীরের আত্ম-দানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তাই পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদাকে রাজা রাবণ প্রশ্ন করেছিলেন—

'দেশ বৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গ পুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ?'

মধুসূদনের কাব্যে যে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তা মূলতঃ স্বদেশের

ভৌগোলিক আয়তন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। মধুসূদনের কাব্যটি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ-বিরোধিতায় নয় এবং মধুসূদন সে চেষ্টা করেননি কিন্তু তাঁর কাব্যে স্বদেশের ঐতিহ্য ও গৌরববোধের অভাবজাত বেদনার পরিচয় রয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনা থেকে শুরু ক'রে 'চতুর্দশ পদাবলী'র—

'আমরা দুর্বল ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে
পরাধীন হা বিধাতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?'—ইত্যাদি অংশে

তা ফুটে উঠেছে। মধুসূদনের কাব্যে দেশপ্রেম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেছেন—'শূলের মত সংকীর্ণ নয় বা স্তম্ভের মত উত্তুঙ্গ নয়, ভূতলের মত সমতল ও নিরাভরণ। আর রাজপুত্র অশোকের মত সেখানে উপবিষ্ট বলেই সম্রাটজনোচিত সুনিশ্চিত তাঁর ভবিষ্যৎ।'

স্বদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে যে স্বদেশ প্রেম উনিশ শতকের বাংলায় গড়ে ওঠে তা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তত প্রবল ছিল না। তার পরিবর্তে শিক্ষিত বাঙালীর মনে ইংরেজ জাতি সম্পর্কে একটা মোহ সৃষ্টি হ'তে দেখা গিয়েছিল। এই মোহের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে সে যুগে ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে দেশজ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রায় কোণঠাসা হ'য়ে পড়েছিল। ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শ খুব স্বল্পকালের জন্য শিক্ষিত বাঙালী মন আচ্ছন্ন ক'রে রাখলেও তা কাটিয়ে উঠতে খুব দেরী হয়নি। তাই উনিশ শতকের শেষার্ধকে ইংরেজ সম্পর্কিত মোহমুক্তির যুগ নামে অভিহিত করা যায়। এই মোহমুক্তির যুগে বাংলা কাব্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটে। হেমচন্দ্র বীররসাত্মক আখ্যান কাব্য রচনার জন্য সুপরিচিত হলেও তাঁর দেশপ্রীতি-মূলক গীতিকবিতাগুলির মূল্যও সে যুগে খুব কম ছিল না। তিনি সচেতন ভাবে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে 'ভারত বিলাপ', 'পদ্মের মৃণাল' 'যমুনা তটে' ইত্যাদি কবিতায় স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন—

'মাগো ও মা জন্মভূমি !
আর কতকাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।'

হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। উল্লেখযোগ্য যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্'-এর

ভারত আগমনের ঘটনা উপলক্ষ্যে 'ভারত-ভিক্ষা' কবিতাটি রচিত হ'য়েছিল।

বাংলা কাব্যে স্বদেশ প্রেমের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে পণ্ডিত মনীষী ও গদ্যলেখক হিসাবে সুপরিচিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বদেশপ্রীতির পরিচয় আছে।

আলোচ্য গ্রন্থের 'উৎসর্গ' কবিতাটিতে পরাধীনতার বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে তিনি বলেছেন—

'অরুণ উদিল, জাগিল জননী।
জাগিল ভারত, দুখিনী জননী।
"উঠ মা জননি উঠ মা জননি"
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি।'

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'বহুদূরে নয়' কবিতাটিতে স্বদেশচিন্তার যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্ত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হ'য়েছে—

'শেষে ডেকে বলি ও মুসলমান ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই।
দেশের দুর্দশা দেখা হলো ঢের,
তোরা তো সন্তান প্রিয় ভারতের।
সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে।
পুঁতে রাখ কথা, 'মুসলিম', 'কাফের'
বল শুধু মোরা প্রিয় ভারতের।'

ভগবৎ প্রেমের পরই শিবনাথ শাস্ত্রী স্থান দিয়েছিলেন স্বদেশ প্রেমের। তাঁর রচিত উপাসনা সঙ্গীতেও স্বদেশের কথা স্থান পেয়েছে। তাই তিনি বলেছেন—

'তব পদেঁলই শরণ। আর্যদের প্রিয় ভূমি,
সাধকের ভারতভূমি, অবসন্ন আছে। অচেতন হে।'

স্বদেশচিন্তার দিক দিয়ে নবীনচন্দ্র সেন ঈশ্বরগুপ্তের অনুগামী ছিলেন।

'সায়ংচিন্তা'-য় তিনি গুপ্তকবির মতই ভারতের দুর্দশার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে জানিয়ে বলেছেন—

'রাণী যিনি, কহ তারে এ সব যাতনা,
কাঁদিবেন দয়াবতী ভারত রোদনে।'

ছাত্রাবস্থা থেকেই নবীনচন্দ্রের অন্তরে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটে। তাঁর রচিত 'অবকাশ রঞ্জিনী'র কবিতাগুলিতে নবীনচন্দ্রের স্বাধীনতা স্পৃহার পরিচয় পাওয়া যায়। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে' যে দেশপ্রেমের অগ্নিকণা অন্তর্নিহিত ছিল তা প্রতিটি বাঙালীর অন্তরে দাবানলের সৃষ্টি করে। নবীনচন্দ্র শুধু জাতীয়তাবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে ভারতবর্ষে ভেদহীন এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের কথাও কল্পনা করেছেন।

সাহিত্যের নানা শাখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতার মধ্যেও আমরা স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পেয়ে থাকি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা শুধু পরাধীন জাতির বেদনা ও ক্রন্দনে পরিপূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতিকে শক্তি ও সাহসে যেমন উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন তেমনি তাঁর কবিতা ও গানে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা নানা ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গবীর', 'গুরুগোবিন্দ', 'দুরন্ত আশা' প্রভৃতি কবিতায় দেশপ্রেমের পরিচয় আছে। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দারিদ্র্যপীড়িত, ভগ্নস্বাস্থ্য, শিক্ষাহীন দেশবাসীর প্রতি প্রবল অনুরাগ থেকে দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় বলতে চেয়েছেন—

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষ পট।'

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'শরৎ' ইত্যাদি কবিতায় স্বদেশ প্রকৃতির বর্ণনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রেক্ষাপটে রচিত 'কথা'-কাব্যের 'বন্দী বীর', 'হোরিখেলা', 'পণরক্ষা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশানুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'কাহিনী'র অন্তর্গত 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দুর্যোধনকে দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শক্তির প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী বৃটিশ রাজশক্তির ও দুর্যোধনকে সমগোত্রীয়রূপে ইঙ্গিত দিয়ে

দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দেশচেতনা অনেকখানি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দীক্ষা', 'প্রাণ', 'ন্যায়দণ্ড', 'প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতায় তা প্রাচীন ভারতের শৌর্য-বীর্য ক্ষাত্র-আদর্শের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের নানা গান ও 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সবুজের অভিযান', 'শঙ্খ' ইত্যাদি কবিতায় নিশ্চেষ্ট জড় যুব শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ কর্মে আহ্বান জানিয়ে যুব শক্তিকে জাগ্রত করার সাধনায় স্বদেশপ্রেমকে এক ভিন্ন রূপে প্রকাশ করলেন।

রবীন্দ্র সমসাময়িক কালের কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্যগাথা কাব্যের ১ম ভাগে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্যগাথার ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন—'যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্য্যগাথা' তাহারই আদর চাহে।' আর্য্যগাথার আর্য্যবীণা' অংশে গ্রথিত 'স্বদেশ স্তোত্র', 'ভারত মাতা', 'জ্বালাও ভারত', 'আয় ভারত সন্তান' ইত্যাদি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রগাঢ় দেশপ্রীতির পরিচয় আছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাঙালীর স্বদেশচিন্তা মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়। একদিকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন অন্যদিকে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামের সূত্রপাত, রুশবিপ্লবের পর ভারতবর্ষে কম্যুনিজমের প্রতি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আগ্রহ ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তনের ঘটনা বাঙালী-কবিদের দেশানুরাগকে নূতন পথে পরিচালিত করলো। এ যুগে যে সমস্ত কবি দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, দীনেশ দাস, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদেশে মার্ক্সীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কবিতায় যাঁরা দেশ-প্রেমের স্বাক্ষর এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম স্মরণীয়।

চীন-ভারত যুদ্ধ, পাক-ভারত যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা নকশালবাড়ী আন্দোলনকে সামনে বিচিত্র স্বাদের দেশাত্মবোধক কবিতা বাংলায় রচিত হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে।

বাংলার রোমান্টিক কবিরাও জাতির বিপর্যয়ের দিনে লেখনী ধারণ করে স্বদেশ প্রেমের কবিতা রচনার মাধ্যমে প্রবল দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ দাশগুপ্ত, কবিরুল ইসলাম, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সব্যসাচী দেব, শুভ বসু প্রমুখের নাম এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য।

নিধুবাবু-ঈশ্বরগুপ্ত থেকে শুরু ক'রে বাংলা কবিতা শতাব্দীর পথ ধরে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম ক'রে সমাজ ও রাজনৈতিক কারণে দেশপ্রেমের বৈচিত্র্যময় আদর্শ নির্মাণ করেছে।

# রবীন্দ্র সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব

'ছিন্নপত্রাবলী'র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পরিহাসের ভঙ্গীতে তাঁর সঙ্গে কবি কালিদাসের এনগেজমেন্টের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কবি কালিদাসের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম কিংবা শেষ এনগেজমেন্ট নয়। ভারতীয় সাহিত্যের প্রধানতম কবি হিসাবে কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বাল্যজীবন থেকেই। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপন্যাসিক চেতনা কবি রবীন্দ্রনাথের মনে প্রাচীন ভারতবর্ষের শুচিশুভ্র জীবনবোধের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল কালিদাসের সংস্পর্শে এসে তা আরো গাঢ় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি মানসে সুদূরের ব্যাকুলতা ও সৌন্দর্য পিপাসায় প্রাচীন ভারতীয় কবি কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় যে, তিনি অত্যন্ত অল্প বয়সে কবি কালিদাসের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে 'মেঘদূত' ও কাব্যগুরু বিহারীলালের মুখে 'কুমারসম্ভবে'র আবৃত্তি শোনা তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গৃহশিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে তিনি 'কুমারসম্ভব' ও মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের হেড পণ্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্যের কাছে 'শকুন্তলা'র পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবনে সংস্কৃতচর্চার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন : 'রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন।' অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'কুমার সম্ভবে'র কিছু কিছু অংশের বঙ্গানুবাদও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্য-শিক্ষার সূত্রে কবি কালিদাসের সঙ্গে এই পরিচিতি পরবর্তীকালে তাঁর কবি-জীবনে একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

পৃথিবীর সব দেশের সৃষ্টিশীল লেখকেরাই নিজের দেশের পুরাতন কবি ও কাব্যগ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। পুরাতন সূত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাকে নূতন ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করে থাকেন। কাব্যে বর্ণিত

চরিত্রগুলি তাঁদের হাতে নূতনরূপে লাভ করে। আখ্যান বর্ণনার ক্ষেত্রেও অনেকে সংযোজন, সংশোধন ও পরিবর্তন করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন। মহাকবিদের বাণীতে এমন এক আকর্ষণ আছে যে, তা নিজের কালকে অতিক্রম করে ভাবীকালের কবিদের মনেও প্রেরণার সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস কিংবা হোমার-দান্তে-মিল্টন দেশকালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে চিরন্তনত্ব লাভ করেন। পরবর্তীযুগের দেশ-বিদেশের লেখকদের মনে সঞ্চার করেন অভূতপূর্ব প্রেরণা।

কবি হিসাবে রবীন্দ্রমননে কালিদাসের প্রভাব মূলত লক্ষ্য করা যায় দু'দিক থেকে। প্রথমত তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কালিদাস-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং দ্বিতীয়ত কালিদাসের ভাব-ভাষা ও সৌন্দর্য চেতনায় যে মূল্যবান মণিমুক্তার সন্ধান পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারেন নি। একাধারে ঐতিহ্য ও অন্যদিকে মহাকাব্যের সমৃদ্ধ উপকরণ এ দুয়ের স্বাভাবিক সংমিশ্রণে তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রথম স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়। কবিতাগুলির মধ্যে 'একাল ও সেকাল', 'কুহুধ্বনি' ও 'মেঘদূত' কবিতার নাম উল্লেখযোগ্য। কবিতাগুলির মধ্যে যক্ষের বিরহে ভুলুণ্ঠিতা যক্ষিনী, তপোবনের লতাকুঞ্জে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার লজ্জানম্র সাক্ষাৎকার কিংবা মেঘদূতের বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে মেঘের দেশ-দেশান্তরের উপর দিয়ে উড়ে চলার কথা বর্ণিত হয়েছে। কবি কালিদাসের 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'ঋতুসংহার' ও 'রঘুবংশ' এই চারিটি কাব্য ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' 'বিক্রমোর্বশী' এই তিনটি নাটক সর্বজন গ্রাহ্য। তার মধ্যে রবীন্দ্র সাহিত্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' ও 'বিক্রমোর্বশী'-র প্রভাব একেবারে নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, চিঠিপত্রে কালিদাসে সাতটি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মেঘদূতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন: আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার

আনন্দ আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।' রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে বোঝা যায় মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের যাদুস্পর্শ তাঁর মনে যে শৈশবানুষঙ্গের সৃষ্টি করেছিল তার সঙ্গে মেঘদূতের চিত্রধর্মিতা, গীতিময়তা ও ধ্যানগাম্ভীর্য একত্রিত হয়ে তাঁর মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। অমরপ্রেমের কাব্য 'মেঘদূতে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় পেয়ে লিখেছিলেন :

'প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষণ
নববৃষ্টি বারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘন স্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিনী সম।'

শুধু 'মেঘদূত' কবিতায় নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বহু কবিতায়, গানে, চিঠিপত্রে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' মেঘের পুঞ্জিত রূপে চিরবিরহের মর্মান্তিক বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

কবি কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মেঘদূত' কবিতায় লিখেছিলেন :

'কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত!'

কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে আষাঢ়ের প্রথম দিবসের কথা থাকায় দিনটি রবীন্দ্রনাথের জীবনে কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে যেখানে তিনি লিখেছেন : 'ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে—সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘ জীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে—নিদেন আমার পক্ষে।' শুধু আষাঢ়ের প্রথম দিন নয়, আষাঢ় শব্দটি নববর্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিরহী মনের কাছে যেন নূতন বার্তা এনে দিয়েছে। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বালক' কবিতাটিতে এই মনোভাব প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'অশোক বনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।
আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ষার গানে আষাঢ়ের বৃষ্টিপাতের শব্দে মহাকবি কালিদাসের কাব্যের ছন্দ প্রতিধ্বনিত হতে শুনেছেন। বর্ষার সজল প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে তিনি বিরহিনী মালবিকার প্রতীক্ষা কাতরতা উপলব্ধি করে লিখেছেন :

বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝর ঝর বরিষণে।
যে মিলনের মালাগুলি ধূলায় মিশে হল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে।
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা নদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈল শিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।

রবীন্দ্র জীবনে কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রভাবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক ভাবে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মেঘদূত' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বিরহী যক্ষের ব্যক্তিগত বেদনাকে সার্বজনীন করে তুলে উক্ত প্রবন্ধে মেঘদূতের নবভাষ্য রচনা করে বলেছেন : 'রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে চিরকালের মত আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।'

'মেঘদূত' কবিতা ছাড়াও 'মেঘদূত' কাব্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতায় চিরবিরহের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। মানসীর যুগে রবীন্দ্রনাথের কবি মনে যে কালিদাস চর্চার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায় তার পরিণতি ঘটেছে 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে। 'চৈতালি'র 'মেঘদূত' কবিতাটিতে 'মেঘদূত' কাব্যের অন্তর্নিহিত

ভাবব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে। 'চৈতালি'র 'কালিদাসের প্রতি' ও 'মানসলোক' কবিতা দুটিতে মেঘদূতের ভাবধারা প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের 'সভ্যতার প্রতি', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত' ইত্যাদি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতের প্রতি আগ্রহের পাশাপাশি কালিদাসের প্রতি কবি মনের সুতীব্র আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। 'চৈতালি'র 'ঋতুসংহার' কবিতায় কবি প্রাচীন ভারতবর্ষের সৌন্দর্যময় পরিবেশের কবি কালিদাসকে রাজকীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন :

'হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্প কুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্যে সিংহাসন পরে।...
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জন প্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী।'

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষামঙ্গল', 'স্বপ্ন' কবিতায় কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'বর্ষামঙ্গল', কবিতায় পরিবেশ নির্মাণে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের ভাবানুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

'কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।'

'স্বপ্ন' কবিতাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কল্প-সৌন্দর্যের জগতে পূর্বজন্মের প্রেয়সীকে অন্বেষণের সংবাদ জানিয়ে বলেছেন :

'দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীর পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।'

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সেকাল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগের প্রতি আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করে বলেছেন :

'আমি যদি জন্মে নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন—নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন ঘেরা বাড়ী।'

'সানাই'-কাব্যগ্রন্থের 'যক্ষ' কবিতাটিতে 'মেঘদূতে'র বিরহী যক্ষের বিরহবেদনার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা, এমন কথা বলতে গিয়ে কবি যক্ষের বিরহবেদনাকে দিকে দিকে প্রবাহিত হতে দেখে বলেছেন :

'যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে
বর্ষাবাষ্প-ব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত আমন্ত্রণে
গিরি হতে গিরি শীর্ষে বন হতে বনে।'

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছয়-সংখ্যক কবিতায়, 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'বিচ্ছেদ' কবিতায়, শেষ সপ্তকের আটত্রিশ সংখ্যক কবিতায় 'মেঘদূত', 'যক্ষ', 'প্রভুর শাপ' ইত্যাদি শব্দের অনুষঙ্গে কালিদাসের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের আটচল্লিশ-সংখ্যক কবিতায়, 'পূরবী' কাব্যের 'তপোভঙ্গ' ও 'মহুয়ার'-র 'উজ্জীবন' কবিতায় কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'কল্পনা'-কাব্যগ্রন্থের 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' কবিতা দুটি কুমারসম্ভবের মদনভস্ম ও রতিবিলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কবি কালিদাসের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হলেও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে 'শৈব' রূপে চিহ্নিত করে কবিরদীক্ষা'-য় বলেছেন :

'কালিদাস ছিলেন শৈব
সে পথের পথিক কবিরা।'

সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হলাহল পান করে শিব হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। কবিরাও জীবনসমুদ্র থেকে উত্থিত বিষটুকু কণ্ঠে ধারণ করে অমৃতটুকু পাঠককে দান করেন বলে রবীন্দ্রনাথ কবিকর্মের সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে শিবের উপাসক কালিদাস সম্পর্কে বলেছেন :

'জীবন মন্থন বিষ নিজে করে পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।'

বৈদিক রুদ্রশংকর আর্যেতর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে কল্যাণের দেবতা শিবশংকরে পরিণত হয়েছে। শিবের নৃত্য গীত প্রতিভার স্বীকৃতি পাওয়া যায় ঋগ্বেদে এবং নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ' ও ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' শিবকে 'নটরাজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কালিদাসের কাব্যে রুদ্রদেব ও উমাপতি শিব রূপে তিনি কল্পিত হয়েছেন। কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে পুষ্পশরনিক্ষেপরত মদনকে

তৃতীয় নেত্র থেকে নির্গত অগ্নির সাহায্যে ধ্বংস করায় শিবের রুদ্ররূপ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও কালিদাসের শিব নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গৃহীত হয়েছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যে 'নটরাজ' পরিকল্পনায় অভিনবত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নিজেকে 'নটরাজের চেলা' বলে অভিহিত করেছেন। 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নৃত্যনাট্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—'তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উচ্ছসিত হতে থাকে।' 'শেষ-বর্ষণ' নাট্যকাব্যে কুমারসম্ভবের হর-পার্বতীর মিলনের ইঙ্গিত আছে। সেখানে নটরাজ বলেছেন, 'মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো—

> বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা
> আষাঢ় তোমার মালা।
> তোমার শ্যামল শোভার বুকে
> বিদ্যুতেরি জ্বালা।
> তোমার মন্ত্র বলে
> পাষাণ গলে, ফসল ফলে
> মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।'

ঠিক যেন পঞ্চাগ্নি তপস্যা শেষে শিবকে পেয়ে :

> 'কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি
> ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।'

রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যুচিন্তার ক্ষেত্রে, কল্যাণের অধিদেবতা রূপে শিব চরিত্র পরিকল্পনায়, পঞ্চশর নিক্ষেপ, মদনভস্ম ও রতিবিলাপের প্রসঙ্গসহ নটরাজ পরিকল্পনায় কবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'শকুন্তলা', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে অংশত কালিদাস চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শকুন্তলা চরিত্র। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন :

'......বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা...... ।'

'প্রাচীনসাহিত্যে'র 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধেও কালিদাসের প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে তিনি বলেছেন : 'কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প নাই ; যেটুকু আছে··· তাহাও অসমাপ্ত।···রাজশ্রোতারা যদি গল্পলোলুপ হইতেন তবে কালিদাসের লেখনী হইতে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যাইত।' তা পাওয়া যায়নি বলে খেদ প্রকাশ করলেও 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে তিনি কুমারসম্ভবকে জয়দেবের গীতগোবিন্দের উপর স্থান দিয়ে বলেছেন : জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের নিকট নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়—তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। 'ললিতলবঙ্গ-লতা-'র পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসনা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয় এই শ্লোকগুলি 'ললিতলবঙ্গলতা'র অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজন শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে।' 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'নববর্ষা' প্রবন্ধটিতে কালিদাসের উল্লেখ আছে। সেখানে প্রাচীন ভারতের যুগ-পরিবেশের সঙ্গে বর্তমান ভারতবর্ষের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'মেঘদূতের মেঘ প্রতি বৎসর চির নূতন চির পুরাতন হইয়া দেখা দেয়—বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।' 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'কুমার-সম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রেমের আদর্শ চিত্রণে কালিদাস কতখানি দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন তা উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।···ভারতবর্ষীয়

সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধে কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত।' এই পথ থেকে শকুন্তলা বিচ্যুত হয়েছিল বলে তাকে দুঃখের অনলে অগ্নিশুদ্ধ হতে হয়েছে। 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন: 'বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে, ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্মন্ত শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখে-কাটা পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।'

আধুনিক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রকাশ করে তিনি সেই রত্নভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে যেমন তাঁর রচিত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তেমনি পুরাতন কাব্য। নাটকের বিষয়বস্তু। চরিত্রকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি বিরল রসগ্রাহী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। সেই সূত্রে তাঁর গদ্য রচনায়, গানে, কবিতায়, নাটকে, নৃত্যোনাট্যে মহাকবি কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্যগোচর হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কালিদাসও বাংলা-সাহিত্যে বিশেষভাবে পঠিত ও স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন।

# বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগৎ
# ও
# বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে গীতিকবিতার শাখায় বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে রচিত নানা জাতীয় সাহিত্যে যে অধ্যাত্মবাদের পরিচয় লক্ষ্য করা যায় বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিটিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য মূলতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—১. চৈতন্য পূর্ব এবং ২. চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বা প্রেমধর্মের বিকাশের পাশাপাশি বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থাদি রচিত হ'তে দেখা যায় এবং বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অলঙ্কার শাস্ত্রের ছাঁচে যে জাতীয় পদ রচনা করেন তাতে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূলকথাগুলি কাব্যাকারে প্রকাশিত হওয়ায় এক শ্রেণীর সমালোচক বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যকে গৌড়ীয় 'বৈষ্ণব দর্শনের রসভাষ্য' বলে উল্লেখ ক'রে থাকেন। সুদীর্ঘ কাল ধরে বাঙলা সাহিত্যচর্চা, পঠন-পাঠন ও বৈষ্ণব পদসাহিত্যের আস্বাদন প্রসঙ্গে এই আধ্যাত্মিকতাটুকুকে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রবণতা হলো সমাজ থেকে দেব-কেন্দ্রিকতা ( Theo centric Idea )-কে বিসর্জন দিয়ে মানবকেন্দ্রিকতা ( Anthropo-centric Idea )-র প্রতিষ্ঠা ঘটানো। দেবতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে হ্রাস করে এবং মানুষের জীবনের অগ্রগতির স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দেবনির্ভরতা মানব চরিত্রকে দুর্বল ক'রে তোলে বলে আধুনিক যুগের সমাজ ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আত্ম-প্রত্যয়ী মানুষের আবির্ভাব প্রয়োজনীয় হ'য়ে ওঠায় মধ্যযুগের বাংলায় রচিত তাবৎ সাহিত্যের অন্তরালে মানবিকতাবোধ ও লৌকিক সুরের প্রভাব অন্বেষণ আধুনিক বাঙলা সমালোচনায় একটা নূতন মাত্রা সংযুক্ত করেছে। সঙ্গত কারণেই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিকতাবর্জিত মানবিক হৃদয়বৃত্তির পরিচয় অনুসন্ধান এ যুগের বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে চর্চার ক্ষেত্রে এক নূতন দৃষ্টিকোণ রূপে গৃহীত হতে চলেছে। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন, আধুনিক

যুগ ও পাঠকের রুচি অনুযায়ী বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যকে কতখানি আধ্যাত্মিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে দেখা যেতে পারে। বৈষ্ণব পদাবলী ধর্মাশ্রয়ী কাব্য এবং তার মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্মীয় চিন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাব। সচেতনভাবে এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে এই জাতীয় রচনা করেছেন এবং সেই ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তার রসাস্বাদন ঘটেছে। আধুনিক যুগের মানুষের মনে সেই মধ্যযুগীয় ধর্ম-বিশ্বাসের অপহ্নব ঘটেছে বলেই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের সঙ্গে অন্তর্লীনভাবে গড়ে ওঠা ধর্ম-বিশ্বাস যেমন মিথ্যা হ'য়ে যেতে পারে না, তেমনি মধ্যযুগের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী মানুষ নিজের মনের কথাকেও যেভাবে দেবতার নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেই ছদ্ম-দেববাদের আবরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যযুগের বাঙলায় রচিত সাহিত্যগুলির একটি মানবিক মূল্যায়নও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের সার্বিক মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন।

২.

ভারতীয় সাহিত্যে কৃষ্ণকথার দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি লৌকিক কৃষ্ণকথা আর অন্যটি হলো ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিদগ্ধ সমালোচকরা বলে থাকেন, 'বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধানতম বিষয় যে রাধাকৃষ্ণের ব্রজ প্রেমলীলা তার ইঙ্গিত অথবা প্রকাশ সাহিত্য ও শিল্পে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর আগে পাইনা, যদিও এ কাহিনী যে অনেক আগে থেকেই লোক-সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণের ব্রজ প্রেমলীলা লোক-সাহিত্য থেকেই নেওয়া।[১] লোক-সাহিত্য সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে গড়ে ওঠে এবং মূলত তা ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য বলেই স্বীকৃত হয়ে থাকে। বিশেষ কোন ধর্মগোষ্ঠী লোকসাহিত্য রচনা করলেও তার রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। লোক-সাহিত্যের মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে রহস্য ও বিস্ময়বোধের পরিচয় পাওয়া যায় তার পটভূমিতেই গড়ে ওঠে লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত মানবিক অনুভূতি সম্পন্ন সৃজনধর্মী অথচ শিল্প-সাহিত্যের বিচারে এক অনলঙ্কৃত অনাবরণ ও অনাভরণ প্রকাশ ভঙ্গীতে

১. সেন, সুকুমার—ভূমিকা, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৭।
সাহিত্য আকাডেমী, নূতন দিল্লী।

সমৃদ্ধ ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, গাথা ও গীতিকার মত মূল্যবান সাহিত্য সম্পদ যা জাতীয় জীবনের পরিচয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা যদি লোক-সাহিত্যের উপকরণে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে ধর্মীয় চেতনাকেও বাদ দিয়েও তার মধ্যে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত মানবিকতা-বোধের পরিচয় নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না। চৈতন্য পূর্ব বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল লৌকিক কৃষ্ণকথা ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ছায়া অবলম্বনে। তাই প্রাকৃত পৈঙ্গলে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ুচণ্ডীদাসের রচনায় রাধা-কৃষ্ণের যে রূপমূর্তি গড়ে উঠেছে তাতে ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়ে লৌকিক জীবনের পরিচয়ই অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের নানা প্রকীর্ণ পদে যে কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে তিনি ত্রাতা মধুসূদন নন, বরং নারী-নির্যাতনকারী কুরুচিসম্পন্ন গোপ-বালক হিসাবেই অধিকতর গ্রহণীয়। তাই যেন পদকর্তা রাধার আপাত-মুক্তির পরিচয় দিয়ে বলেছেন :

'অরেরে বাহহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগতি ন দেহি।
তুহুঁ এথনই সন্তার দেহি
জো চাহসি সে লেহি ॥'

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিরহিনী শ্রীরাধা যখন বলে :

'কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইল রান্ধন ॥'—ইত্যাদি

পদে একদিকে যেমন ভক্ত শ্রেষ্ঠা রাধার চেয়ে অসামাজিক প্রেমে আবদ্ধা লৌকিক নারীর পরিচয় অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি বড়ুর ছন্দ স্পন্দনে একটা রাখালিয়া সুর ( Pastoral Tune ) স্পষ্ট হয়ে ওঠায় বড়ুর কাব্য বিষয়বস্তু ও কায়া গঠনের দিক দিয়ে অনেকখানি লৌকিক জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছে।

গোবিন্দদাসের শ্রীরাধার বারমাস্যা বিরহ বেদনায় অভিব্যক্তি ও কাব্য-সৌন্দর্যে আসারণত্ব লাভ করলেও তাঁর রচিত :

'ওই দেখহ অনুরাগে
ফাগুন আওল আগে।

আগে মঝু কছু আশ আছিল
নিশ্চয় নাগর আওবে
বরখি গেলহি অবধি ভেলহি
পুন কি পামরী পাওব।

অংশের তুলনায় কেবল লৌকিক কাঠামো ও চিত্রকল্পের গুণে লোচনদাস রচিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা অধ্যাত্মবোধকে অতিক্রম করে লৌকিক নারীর হৃদয় বিদীর্ণ হাহাকারে পরিণত হয়েছে। যেমন :

'পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে
তুমি দূরদেশে আমি গোঙাইব কার কোলে
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে আমি বলিতে জানি
বিবাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী।'

বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে বিষয়বস্তুর দিক দিকে লৌকিক উপলব্ধি, কায়া গঠনের দিক দিকে লৌকিক ছন্দরীতি, উপমা-অলঙ্কারের প্রয়োগে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে নানা সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে এনে মানুষের মনকে নাড়া দিলেও চৈতন্য পূর্ব বিষ্ণু-নারায়ণ-কৃষ্ণ উপাসনার ধারা এবং পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এই লৌকিক প্রেমের কাব্য-কাহিনীতে যে অধ্যাত্মবোধের সঞ্চার করেছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে লৌকিকতা-অলৌকিকতার সংমিশ্রণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা চলে, 'বৈষ্ণব পদাবলীতে লৌকিক প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে জীব-ঈশ্বরের নিগূঢ় নিত্যসম্বন্ধরূপে প্রকাশ পেয়েছে।'[২]

৩.

বিশ্বের নানা ধর্মীয় দর্শনে একথা ব্যক্ত হয়েছে যে, মানুষ পারমার্থিক সত্তার অংশ বিশেষ। অংশীর সঙ্গে অংশের, পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের, খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের মিলন সাধনের কথা সেখানে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব অধ্যাত্মদর্শনও সেই একই কথাই বলতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানে এই ভাবটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে, 'তোমার আমার মিলন হবে বলে, ফুল্ল কুসুমধরা' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিযুক্ত গানে। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—তাঁর সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে ভক্তের মনে সাধনার সঙ্গে যখন ব্যক্তিগত ভাবাবেগ এসে যুক্ত হয় বৈষ্ণব দর্শনে তখন

২. সেন, সুকুমার—ভূমিকা, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ১০,
সাহিত্য আকাডেমী, নূতন দিল্লী।

তাকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যেরা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের ধর্মকে 'রাগানুগা', নামে অভিহিত করেছেন। রাগানুগা ভক্তি মার্গে বৈধী সাধনার চেয়ে হৃদয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যিনি পূর্ণ, সমগ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁরই অংশ বিশেষ যে খণ্ড, ক্ষুদ্র তার মিলিত হওয়ার বাসনার মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা বৈষ্ণব ধর্মসাধনার মূল লক্ষ্য। এই সম্বন্ধ যখন ঘনিষ্ঠ হয় ও গাঢ় হয়ে ওঠে তখন ভক্ত প্রাকৃত জীবনের মধ্যেও ঈশ্বরের করুণা ও স্নেহস্পর্শ লাভ করে থাকেন। এইভাবে 'ভগবানের স্নেহাবেষ্টনের মধ্যে ভক্তের স্থিতি হয় এবং ভগবান ভক্তের অন্তর বাহির সর্বত্র পূর্ণ করিয়া বিরাজিত থাকেন।'[৩]

ভক্ত ও ভগবানের এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ভক্তিরস আস্বাদনের সম্ভাবনা আছে বলেই বৈষ্ণব পদসাহিত্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের কথা বলা হয়েছে এবং মধুর রসকে সর্বোত্তম রূপে স্বীকার করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'চৈতন্যের প্রকাশের আগে কৃষ্ণ-উপাসনা প্রচলিত হয়েছিল প্রধানত বাল গোপাল ভাবনার পথে।'[৪] শান্ত রসের সাধনার কথা বাদ দিলে দেখা যাবে অন্য চারটি রসের ক্ষেত্রে ঈশ্বর উপাসনার পদ্ধতি হিসাবে আত্মীয়ের ভাবটি প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু যাকে সর্বোত্তম বলে বৈষ্ণব রস শাস্ত্রে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেই মধুর রসের লীলা বা রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্ক সমাজবিধি-বিগর্হিত। এই জন্য জনসমাজে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর খানিকটা বিপদের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। এই বিপদ এড়াবার জন্য এবং কথ্যভাষাশ্রিত লৌকিক কাহিনীকে সর্বভারতীয় জনসমাজের অধ্যাত্ম সাধনায় গ্রহণীয় করার জন্য অগ্রণী হয়ে রূপগোস্বামী—যিনি গার্হস্থ্য জীবনে সুলতান হোসেন শাহার দবীর—খাশ ছিলেন এবং সংসার ত্যাগ করে চৈতন্যের আদেশে ব্রজবাসী 'হয়েছিলেন—সংস্কৃত শাস্ত্রের মঞ্জুষার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীকে তত্ত্ববস্তুরূপে ভরে দিলেন।'[৫] যার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের

৩. দাস, পরিতোষ—সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ২, কলিকাতা

৪. সেন, সুকুমার—ভূমিকা, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৮
সাহিত্য আকাদেমী, নূতন দিল্লী।

৫. সেন, সুকুমার—ভূমিকা, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৯,
সাহিত্য আকাদেমী, নূতন দিল্লী।

ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো বৈষ্ণব রসতত্ত্ব এবং সেই রসতত্ত্বের কাঠামোয় বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য রচিত হওয়ায় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের সঙ্গে তা সম্পৃক্ত হয়ে গেল।

কিন্তু ইতিহাসেরও যেমন পূর্বেতিহাস থাকে তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পূর্বাভাস রয়েছে বিষ্ণু উপাসনার মধ্যে। বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব। বিষ্ণু উপাসনার সবচেয়ে পুরাতন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় ঋগ্বেদে। সেখানে বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব এবং সূর্য, উষা, অগ্নি প্রমুখ দেবতাদের স্রষ্টিকর্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা তাঁকে আদি দেবতা বলে উপাসনা করতেন। তাই বশিষ্ট মণ্ডলে বলা হয়েছে :

'ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ
পরমন্তপ'।

ঋগ্বেদের একটি সূক্তে বলা হয়েছে :

'তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং
জনুষাপিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবিক্ত নমোহন্তে বিষ্ণো
সুমতিং ভজামহে॥'

সূক্তটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়নাচার্য বলেছেন, 'হে স্তোতৃগণ: তোমরা সেই বিষ্ণুকে জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদির দ্বারা তাঁহাকে প্রীতিকর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনি সর্বাগ্রে জলসৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। তাঁহারই নাম সকলের উপাস্য ও জ্যোতির্ময়। সেই নামকে সকল প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় জানিয়া তাঁহারই নাম অনুচ্চারণ করিতে থাক। হে বিষ্ণো: এই ভাবে তোমার নাম করিতে করিতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপসাক্ষাৎ —রূপ সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।'[৬] তৈত্তরীয় উপনিষদে তাঁকে অহস্র শীর্ষ যুক্ত দ্যুতিমান বিশ্বদর্শী, বিশ্বের কারণ বিশ্বাত্মক পরম প্রভু নারায়ণ রূপে বন্দনা করে বলা হয়েছে :

'সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবম্।
বিশ্ব নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্॥'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে কৃষ্ণ বিষ্ণুর স্থান অধিকার করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মানু-

৬ দাস, পরিতোষ—সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ৩, কলিকাতা।

যাঁরা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর উপরে আর কোনো পরতত্ত্ব নেই। মহাভারত, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে কৃষ্ণকে বিষ্ণু বা নারায়ণের অংশ বা অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ কৃষ্ণের অংশাবতার তত্ত্বে সন্তুষ্ট না হয়ে কৃষ্ণকেই চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ বলে গ্রহণ করে এই অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে, কৃষ্ণই একমাত্র পরম পুরুষ, অন্যসব অবতার তাঁর লীলারূপ। তাই চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস বলেছেন :

'সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার।
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করয়ে গণন।
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ॥'

( চৈ. চ. ১।২ )

বৈষ্ণবাচার্যদের সিদ্ধান্ত হলো, ভগবান কৃষ্ণের দুইরূপ—১. মুখ্য প্রকাশ ও ২. বিলাস। মুখ্য প্রকাশ অর্থে :

'একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকার ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥
মহিষী বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল বাস।
ইঁহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥

( চৈ. চ. ১৬৯।৭ম )

অর্থাৎ একই স্বয়ং রূপে, যখন যুগপৎ অনেক স্থানে প্রকাশিত হন এবং প্রকটিত মূর্তিগুলিতে যদি তিনি গুণ—লীলাদির দ্বারা মূলরূপের সমান হন তাহলে ঐ মূর্তিগুলিকে মূলরূপের প্রকাশমূর্তিরূপে গণ্য করা হয়।

'বিলাস' শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

'একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥'

( চৈ. চ. ১।৭৬ )

অর্থাৎ যিনি প্রায় মূলরূপের তুল্য শক্তিধর, কিন্তু আকৃতি, বর্ণ ও নামে পৃথক তাকে বিলাস মূর্তি বলে। বৈষ্ণবেরা নারায়ণকে কৃষ্ণের বিলাস মূর্তিরূপে গ্রহণ করে থাকেন। মনে রাখা প্রয়োজন, 'অধ্যাত্ম ভাব মণ্ডিত শ্রীরাধার অপার্থিব-রূপ রসের ভক্তি ভাবপ্লুত বৈষ্ণবাচার্যদের নিজস্বসৃষ্টি।... চৈতন্য পূর্ববর্তী

জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ুচণ্ডীদাসের রচনায়, শ্রীরাধার চিত্র ঐ সমস্ত কবিদের ভাব—কল্পনার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সত্য এবং দীন চণ্ডীদাসের রচিত পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাও সত্য ; কিন্তু রাধাপ্রেম কি বস্তু, রাধাভাবের সাধনা কি রূপ, তাহা চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহার শেষ জীবনের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন।[৭]

শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপে আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় বলেছিলেন :

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কী দৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা -
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দু॥'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপ অবতার গ্রহণের মুখ্য তিনটি উদ্দেশ্য হলো ১. শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা উপলব্ধি করা, ২. যে প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা তাঁর মাধুর্যরস আস্বাদন করেন, সেই আস্বাদনের স্বরূপ অবগত হওয়া এবং ৩. ঐ রূপ আস্বাদনের দ্বারা তিনি কি রূপ আনন্দ লাভ করেন, তা অনুভব করা। প্রধানত, এই তিন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শচীগর্ভ সিন্ধুতে উদিত হয়েছিলেন। স্বরূপ দামোদরের মত কৃষ্ণদাস ও শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন :

'রাধিকার প্রেম-দেহ অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকার, ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥' (চৈ. চ)

কিংবা,

'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে—চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥' (চৈ. চ.)

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে তাঁর জীবনকে সামনে রেখে বৈষ্ণব রস শাস্ত্র ও বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য নির্মিত হওয়া তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ লেগেছে।

---

৭. দাস, পরিতোষ—সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ. ২৪, কলিকাতা।

৪০

বৈষ্ণবেরা পরম ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে মনে করে থাকেন :

'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নবরূপ তাঁহার প্রকাশ।'—

কেননা তাঁরা জানেন, 'শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যই প্রধান। ভগবান পূর্ণ ঐশ্বর্যময় হইয়াও নরলীলা রূপ পূর্ণ মাধুর্যের আবরণে নিজেকে মধুর করিয়া তুলিয়াছেন'[৮] স্বয়ং ভগবানের এই মাধুর্যময় রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে মর্ত্য পৃথিবীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই বিশ্বাস থেকে বাসু ঘোষ বলেছেন :

'গৌর নহিত কি মেন হইত
কেমন ধরিত দে
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে আনত কে?'

তাই সমগ্র বৈষ্ণব সমাজ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনাচরণের মাধ্যমেই বৃন্দাবন-লীলা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণের এই আকাঙ্ক্ষা কতখানি পূর্ণ করতে পেরেছিলেন তার পরিচয় দিয়ে কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন :

'আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে ক'রে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥'

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তদের বলেছিলেন যে যেমন ভাবে তাঁকে ভজনা করে তিনি তাকে সেইভাবে ধরা দিয়ে থাকেন, শ্রীচৈতন্যদেবও যেন শ্রীকৃষ্ণের সেই উক্তির প্রতিধ্বনি করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে ভক্তদের কাছে যেন ঠিক সেইভাবেই ধরা দিতে চেয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বর্ণিত রসগুলি শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে রচিত পদগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক পালাবদ্ধ সংকীর্তন গানের পুরোভাগে 'গৌরচন্দ্রিকা'র ব্যবহার শ্রীচৈতন্যের যুগ্ম অবতার রূপে অবতীর্ণ হওয়ার লোক

---

৮. মজুমদার, বিমান বিহারী—ভূমিকা, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, পৃ. ৪ কলিকাতা।

—বিশ্বাসকেই যেন জয় যুক্ত করে তুলেছে। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সাহায্য ছাড়া বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের রসাস্বাদন অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

৫.

চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের দ্বারা যত না আস্বাদিত হয়েছে তার চেয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মানবিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করা প্রয়াসই ছিল অনেক বেশী। একদিকে লোক-প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণের জীবনলীলায় লৌকিক উপকরণ, অন্যদিকে বিদ্যাপতির মত চৈতন্যপূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠতম কবির রাজসভার বিদগ্ধ শ্রোতাদের জন্য রচিত ছন্দ-আদিরসাত্মক পদ ঈশ্বরচেতনার আবরণে প্রকাশিত হলেও তার মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল ক্ষীণ। চৈতন্যপূর্ব বাঙলা রাধা-কৃষ্ণ লীলার পদ রচনাকার হিসাবে খ্যাতিমান কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মত অবৈষ্ণব কবি ছিলেন। বিদ্যাপতি ছিলেন পঞ্চোপাসক রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদের বাইরেও তিনি অন্যান্য দেব-দেবীকে বিশেষত শিবকে নিয়ে পদ রচনা করেছেন আর বাংলার মরমী কবি চণ্ডীদাস ছিলেন বাশুলী সেবক বাশুলী হলেন মূলতঃ সরস্বতী ( বাগীশ্বরী )। সুতরাং একথা বলা চলে যে, চৈতন্য পূর্বযুগে বৈষ্ণবদর্শন বা বৈষ্ণব সমাজ গড়ে না ওঠার ফলে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ তখনো সম্প্রদায়গত বিশ্বাসের অবলম্বন হয়ে ওঠেনি। চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে পাঠকবর্গ মানব-জীবনের কাব্য হিসাবে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় সমাজ পরিবেশে কবির আত্মগত অনুভূতি সরাসরি প্রকাশের সুযোগ না থাকায় বৈষ্ণব পদকর্তারা তা প্রকাশের জন্য বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের কাঠামোটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

বৈষ্ণব সমাজে সর্বাধিক সমাদৃত গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রধানতম অংশ রাস পঞ্চাধ্যায় অবলম্বনে রচিত গীতগোবিন্দকে জয়দেব হরিস্মরণ বিলাসকলার কাব্য হিসাবে উল্লেখ করলেও সেখানে হরিস্মরণের প্রসঙ্গ ম্লান হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাই কাব্যটিকে 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী'র মর্যাদা এনে দিয়েছে। এই ব্যাপারটি কীভাবে হয়ে উঠেছে তা বর্ণনা করা যেতে পারে। ভাগবতের রাস-নৃত্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে :

> 'বাহু প্রসার পরিরম্ভ করাল কোরু নীবীস্তনালভনর্ম নখাগ্রপাতৈঃ।
> হসিতৈরজ সুন্দরীণা-মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়ংচকার ॥'

অর্থাৎ বাহু প্রসারণ, আলিঙ্গনে এবং হস্ত গণ্ডস্থলে বিলম্বিত কেশগুচ্ছ, ঊরু,

কটির বস্ত্রগ্রন্থি ও স্তনদেশ স্পর্শদ্বারা এবং নখাগ্রপাতে, কটাক্ষ নিক্ষেপ হাস্য পরিহাস ও ক্রীড়াদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের কাম ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া ক্রীড়া করাইলেন। (শ্রীমদ্ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৯শ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক—অনু: মহানাম-ব্রত ব্রহ্মচারী)।

কবি জয়দেব রাসনৃত্য বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন :

'শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি। পশ্যতি সস্মিত চারু
পরামপরামনু-গচ্ছতি বামা।'

অর্থাৎ কৃষ্ণ কোন গোপীকে চুম্বন, কোনো রামার রতিবর্ধন করিতেছেন, তিনি সহাস্য বদনে কাহারও প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া অনুরাগের সহিত অপর গোপীর অনুসরণ করিতেছেন। (গীতগোবিন্দ, ১ম সর্গ, শ্লোক ৪৬, অনু: শ্রীকৃষ্ণচরণ বিদ্যাভূষণ)। উদ্ধৃত অংশ থেকে অনুমান করা যায় যে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' যদি শুধু অধ্যাত্ম বিশ্বাসের মানদণ্ডে রচিত হতো তাহলে তা কখনোই সারা ভারতবর্ষে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারতো না। জয়দেব গীত-গোবিন্দকে ধর্মীয় বিশ্বাসের আবরণে আবৃত করার চেষ্টা করলেও তিনি ভাগবতকে সেখানে হুবহু অনুসরণ করেননি এবং রাধা কৃষ্ণের রতি-বিলাসের মধ্যে মানবিক অনুভূতিকেই তিনি বড় করে তুলেছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো—ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নেই, মানভঞ্জনের বিস্তৃত বর্ণনাও সেখানে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু, 'গীতগোবিন্দে শ্রীরাধার বিস্তৃতি জয়দেবের অসাধারণ কবিত্বগুণে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার জন্য গীতগোবিন্দের প্রভাব সমগ্র ভারত বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।'[৯] জয়দেব কর্তৃক সৃষ্ট অধ্যাত্ম ভাবনার ক্ষেত্রে লৌকিক রসের এই প্রয়োগ সমগ্র মধ্যযুগে রচিত বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যেখানে লৌকিক জীবনানুভূতির পরিচয় রয়েছে তার উপর জোর করে বৈষ্ণবদর্শন বা ধর্মীয় বিশ্বাস আরোপ করলে তার কাব্য সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যশোরাজ খান রচিত অভিসার পর্যায়ের পদে রাধার অধ্যাত্মবোধের চেয়ে মানবীয় মিলন ব্যাকুলতাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই যেন পদকর্তা বলেছেন :

'এক পয়োধর চন্দনলেপিত
আর পয়োধর গোর।

৯. ঘোষ, সতী (ড:)—ভূমিকা, ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৯
রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

হিম ধরাধর কনক ভূধর
কোলে মিলল জোর ॥'

লোচনদাসের পদে :

'চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর ।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর ॥'

কিংবা জ্ঞানদাসের পদে :

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল ।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান ।
অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে-পরাণ ॥'

ইত্যাদি অংশে যে রোমান্টিক অনুভূতি ও কাব্যসৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাস নিরপেক্ষভাবেই পাঠকের মনকে অনাস্বাদিতপূর্ব রসের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে তোলে। তাই প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, 'পদাবলীর মধ্যে ভক্ত সাধক কবি তাঁদের উত্তপ্ত হৃদয়াবেগ অবোধপূর্বভাবে সঞ্চালিত করতে পেরেছিলেন এবং কথঞ্চিৎ তা সাধারণ শ্রোতার হৃদয়ও স্পর্শ করতে পেরেছিল।[১০] শুধু নর-নারীর জীবনের প্রেমানুভূতির বর্ণনা নয়, বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের উর্ধ্বে মানবিক অনুভূতিকে উপলব্ধির ব্যাপারে অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষেত্র রয়েছে তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা এবং গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা চলে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে শ্যামদাস বলেন :

'নন্দদুলাল মোর আঙ্গিনায় খেলাএ রে ।
নাচি নাচি চলি যায় বাজন নূপুর পায়
আপনার অঙ্গছায়া ধরিবারে পায় ॥'

তার পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলরাম দাস বলেন :

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল ।
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল ।

১০. সেন, সুকুমার—ভূমিকা, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ১১,
সাহিত্য আকাদেমী, নূতন দিল্লী ।

বিশাল হৃদয়ে গজ মুকতায় হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার ॥'

এই জাতীয় পদে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান বা ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করার চেয়ে মাতা-পুত্রের স্নেহ ব্যাকুল পার্থিব বাৎসল্য রসাশ্রিত জগৎটিকেই যেন বড় বেশী সুন্দর ও মধুর করে তোলা হয়েছে। গোবিন্দ দাস রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-কমলে মধুলোভী ভ্রমরের মত ভক্তবৃন্দের নিশিদিন অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকার বর্ণনায় প্রেমধর্ম প্রচারে জয়যুক্ত শ্রীচৈতন্যের সাফল্যময় ভূমিকাটিকে পদকর্তা অপূর্ব মানবিকতাবোধে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

শুধু রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান নয়, জীবন সম্পর্কিত গভীরতর অনুভূতির প্রকাশে বৈষ্ণব পদকর্তারা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অতিক্রম করে বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বলরাম দাস রচিত একটি পদ প্রায় Epigram-এর মর্যাদা লাভ করতে পারে। পদটিতে তিনি বলেছেন:

'ধনজন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূণ্য হৈল এ তিন ভুবন ॥'

৬.

একদিকে চৈতন্যপূর্ব লৌকিক রাধা-কৃষ্ণ, অন্যদিকে চৈতন্য আবির্ভাবের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ দু'য়ের মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য নির্মাণ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সম্পর্কিত ধারণা ছাড়া তা উপলব্ধি করা যায় না। তাছাড়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং তাঁর দিব্যজীবনের প্রভাবে বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটেছে তা জানার জন্য বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা যায় না। প্রায় সব সুধী সমালোচক এ বিষয়ে একমত হয়ে বলেছেন— 'রাধাকৃষ্ণ প্রেম সাহিত্যকে আধ্যাত্মিকতার অতখানি উচ্চগ্রাম হইতে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার যে একটা দৃষ্টি রহিয়াছে, সে দুটি মুখ্যতঃ চৈতন্য যুগেরই দান বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাবে এবং আচরণে তাঁহার পরমভক্ত এবং পরম জ্ঞানীগুণী পরিবারবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে শ্রীরাধার এক নব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম; এই আবির্ভাবের দিব্যদ্যুতি এখনো বাঙালীর চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে এবং এই কারণেই আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের আস্বাদন কালে সাহিত্যরসের সহিত অধ্যাত্মরসের মিশ্রণ না ঘটাইয়া পারি না; এই মিশ্রণ বা

সমন্বয় ব্যতীত বৈষ্ণব সাহিত্যের আস্বাদনে কোথায় একটা অপূর্ণতা থাকিয়া যায়।'[১১] তাই কবির ভাষায় বলতে পারি :

'... ... ... ... ...দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে—শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা... ... ... ... ...।'

১১. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ২৭৫, ১ম সং, কলিকাতা।

# বাংলা সাহিত্যে -রামায়ণমহাভারতের প্রভাব

ইলিয়াড, অডিসি, রামায়ণ ও মহাভারত এই চারটি গ্রন্থ পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য হিসাবে সুপরিচিত। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন…' it is a long narrative poem on a great and Serious Subject, related in an elevated style, and centered on a heroic or quasi-divine figure on whose action depends the fate of a tribe, a nation, or the human race.' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রামায়ণ' প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ই হাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন ; ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তি বিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।' ঐ প্রবন্ধটিকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি কাব্যদুটিকে কেবল মহাকাব্য বলে মনে করেন নি, তার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিকৃত হতে দেখে বলেছেন, 'রামায়ণ ও মহাভারতকে আমি বিশেষতঃ এই ভাবে দেখি। ইহার সরল, অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।' রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দু'টি কেবল বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়নি, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে যেমন নূতন গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে, তেমনি বাঙালী লেখকদের রচনায় মহাকাব্য দুটির আখ্যান ও চরিত্রগুলি নূতন মূল্যবোধে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। বাঙালী মানসে তাই রামায়ণ-মহাভারতের চিরপ্রবহমানতার ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী' রামায়ণে আদিতম অনুবাদ। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অনুসরণে তাঁর রাম পাঁচালী অনুবাদ করলেও তিনি তাঁর কবি প্রতিভার মৌলিকতায় এই মহাকাব্যটিকে আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত করে তার আখ্যানভাগকে বাঙালী সমাজ পরিবেশের উপযোগী করে-তুলেছেন। কৃত্তিবাসের পর কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী কৃত্তিবাসী রামায়ণের

আখ্যান অবলম্বনে 'অঙ্গদের রায়বার' ও 'তরণীসেন বধ' নামক আখ্যানকাব্য রচনা করেন। সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে দ্বিজ লক্ষ্মণ রচিত 'রাম পাঁচালী'তে কেবলমাত্র আদিকাণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের কবি অদ্ভুতাচার্য বাল্মীকির রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে যে রাম-কাহিনী রচনা করেছিলেন তা 'অদ্ভুত-রামায়ণ' নামে পরিচিত। মহিলা কবি এবং দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী লৌকিক কাহিনীর উপর নির্ভর করে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া রামানন্দ ঘোষ, জগৎরাম, রামপ্রসাদ প্রমুখ রাম-কাহিনী নিয়ে 'রাম-রসায়ন' রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা যে অধ্যাত্মবোধ ও বিশ্বাস নিয়ে রাম-কাহিনীর বঙ্গানুবাদ করেন অথবা রাম-কাহিনী অনুসরণে কাব্য রচনা করেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী নব্য যুবকেরা প্রাচীন ঐতিহ্যকে নূতনভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। পুরাতন মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনা এবং পুরাতন জীবনাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে নূতন যুগের উপযোগী করে পরিবেশনে উদ্দেশ্যে যাত্রা ও নাটকে রাম-কাহিনীর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় নাটকের মধ্যে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', হরিশচন্দ্র মিত্রের 'জানকী', হরিমোহন কর্মকারের 'ইন্দুমতী', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীতার বনবাস', 'রাম-বনবাস' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব যাত্রা-নাটকে রামের দেবত্ব ও ভক্তির আতিশয্য বাংলা রামায়ণের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। যাত্রা পালার মধ্যে চমকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই জাতীয় নাটকের রচয়িতাগণ যে ভাবে অলৌকিক ঘটনার প্রয়োগ করেন তার ফলে বাঙালী মনে পুরাতন বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-ব্রাহ্ম খ্রীস্টান ধর্মের সংঘাত জাত অনুকূল-প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া। দয়ানন্দ সরস্বতীর নানাবিধ কর্মসূচী। আর্য সমাজের প্রভাব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মপ্রকাশ বাঙালীর মনে নূতন প্রত্যয় সৃষ্টি করে হিন্দুত্বের এই পুনরুত্থানের যুগে পৌরাণিক নাটকের সাহায্যে বাঙালী মনে ভক্তি রসের উদ্বোধনের জন্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'সীতাহরণ' প্রভৃতি নাটকে প্রাচীন ভক্তিবাদ ও অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস জয়ী হয়েছে। রামকাহিনী নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী'

ও 'সীতা' নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 'পাষাণী' নাটকের ইন্দ্র ও অহল্যা চরিত্র নূতন ভাবে সৃষ্টি করতে গিয়ে পৌরাণিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেছেন। 'পাষাণী' নাটকের এই ত্রুটি দ্বিজেন্দ্রলাল 'সীতা' নাটকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'সীতা' নাটকে তিনি রামায়ণের আখ্যান ভাগ ও চরিত্রগুলিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার ফলে একদিকে যেমন নবযুগের দাবী স্বীকৃত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাও রচনা নৈপুণ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

যাত্রা-নাটকের মত বাংলা কাব্যরচনার ক্ষেত্রেও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী নবযুগের আলোকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে রাম-কাহিনীকে গ্রহণ করে তাকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে এসেছিল। নব্য শিক্ষিত বাঙালী কবিদের রচনায় রাম-কাহিনী তাই কলেবর ধারণ করেছে। তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে। মধুসূদন পাশ্চাত্য মহাকাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মহাকাব্য রচনায় আত্ম-নিয়োগ করলেও কাব্য-কাহিনীর জন্য তিনি রাম-কাহিনীকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাছাড়া 'নমি আমি কবিগুরু, তব পাদম্বুজে বাল্মীকি' বলে মহাকবিকে তিনি কেবল গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী প্রণাম জানান নি, চতুর্থ সর্গে পঞ্চবটী বনের বর্ণনায়, রাম-সীতার দাম্পত্য জীবন চিত্র রচনা ও অশোকবনে সীতা-সরমার কথোপকথনে, রাক্ষসদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বর্ণনায় মধুসূদন বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণ করায় বাল্মীকির প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম যুক্তি সঙ্গত হয়ে উঠেছে। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য ছাড়াও 'বীরাঙ্গনা' পত্র কাব্যের অন্তর্গত 'দশরথের প্রতি কৈকয়ী' ও 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা' পত্র দু'টি রাম-কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। পত্র দুটির কৈকেয়ী ও শূর্পণখা চরিত্র রাম-কাহিনী থেকে গৃহীত হলেও তা সম্পূর্ণ নূতন চিন্তা-ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রী স্বাধীনতা ও নারী ব্যক্তিত্বের জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদন এই পুরাতন চরিত্র দুটিকে নারী-প্রগতি ও নারী-মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা হিসাবে বিদ্রোহিনী করে তুলেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথের রচনায় রামায়ণ ও রাম-কাহিনী নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রামায়ণ ও রামচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'পুরস্কার' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সুপ্রাচীন যুগে ঘটে যাওয়া রামায়ণের ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—

'আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।'

ভৃত্যরাজতন্ত্রের অধীনে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন সীতার মত খড়ির গণ্ডীর মধ্যে বর্ধিত হয়ে উঠলেও রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকির প্রতি তাঁর অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর কাব্যগুরু বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে সেই আকর্ষণের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সত্য সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বলেছেন—

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে
সত্য জেনো।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যে' গ্রন্থের অন্তর্গত কবি জীবনী প্রবন্ধে এবং 'রক্তকরবী' নাটকের মুখবন্ধে নাটকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামায়ণের কথা উল্লেখ করেছেন।' 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কাহিনীকে নূতন তাৎপর্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। লক্ষ্য করা যায় যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় রামায়ণের 'দশানন' চরিত্রটি নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন—

'সীতারে পার না ছুঁতে।
ছলবল সমস্ত কৌশল
নিজেই বিফল করো
শেষ তার সম্মতি ভিক্ষায়!
হৃদয়ের এ সম্মানে
রামায়ণ অন্য দীপ্তি পায়।

'শ্রীরাম' কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—

'পিতৃসত্য, লোকসত্য
সকলের সব সত্য পালনের পর
আপন গহন সত্য
খুঁজিবার রহে যেন কিছু অবসর।'

লক্ষ্যণীয় যে, কৃত্তিবাস থেকে শুরু করে আধুনিক বাঙালী কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্যন্ত রাম-কাহিনী ও রামায়ণের নানা চরিত্র বিভিন্ন জনের হাতে নূতন রূপ লাভ করেছে। তাই ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করে বলা যায়— 'আধুনিক বাংলা কাব্যের যাত্রারম্ভে রামায়ণ মহাকাব্য ও তার স্রষ্টা আদি কবি বাল্মীকির কবিত্বলাভের বৃত্তান্তের ব্যবহারোপযোগিতাই প্রমাণ করে রামায়ণ ও রামায়ণের বাল্মীকির চিরত্ব তথা আধুনিকতা গভীরে মানবরস সমৃদ্ধ বাস্তব চেতনাবিদ্ধ কল্পনাশক্তিতেই নিহিত।'

রামায়ণের মতো বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাবৎ সুদূর প্রসারী। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, রন্ধনে দ্রৌপদী, বিদুরের ক্ষুদ, দাতাকর্ণ, ভীমের গদা ইত্যাদি প্রসঙ্গ প্রবাদ-প্রবচনের মত বাঙালী জীবনে গৃহীত হয়েছে। রামায়ণের মত মহাভারত বাঙালী জীবনে পারিবারিক আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়নি। যুদ্ধের রণোন্মাদনায় পারিবারিক জীবনের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ সেখানে নষ্ট হ'য়ে গেলেও অমৃত সমান ভারত কথা আজো বাঙালী মনে অমৃতবারি সিঞ্চন ক'রে থাকে। সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, মহৎ বীর্যের উদ্বোধনের জন্য মহাভারতের কাহিনী চির নূতন হ'য়ে আছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনূদিত ভারতকথাগুলির মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডব বিজয়' ও শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ পর্বের কথা উল্লেখযোগ্য। কবীন্দ্র পরমেশ্বর লস্কর পরাগল খাঁ এবং শ্রীকর নন্দী পরাগলের পুত্র ছুটির খাঁর উৎসাহে কাব্য রচনা করেছিলেন। বাঙালী পাঠকের কাছে মহাভারতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে রয়েছে কাশীরাম দাসের অনুবাদ। কাশীরাম দাস মহাভারতের আদিতম রচয়িতা না হলেও সার্থক অনুবাদের কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। কাশীরাম ব্যাসদেবকৃত মহাভারতের অনুবাদ করলেও কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা তিনি গ্রহণ করেছেন, বহু নূতন বিষয়ও তিনি তাঁর গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। বিশেষভাবে অশ্বমেধ পর্বে মূল মহাভারত থেকে কাশীরাম দাসের বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। মূল মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বের কোনো উল্লেখ নেই। জৈমিনী মহাভারত ও গর্গ সংহিতার অনুসরণে তা গৃহীত হয়েছে। রামায়ণের মত মধ্যযুগীয় কাহিনী অবলম্বনে ভারত কথার অনুসরণে আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যেও নানা নাটক, কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে।

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন নাট্যকার 'অভিমন্যুবধ,, 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'নল-দময়ন্তী' ইত্যাদি একই নামে একাধিক নাটক রচনা করেছেন। যে সমস্ত নাট্যকার এই জাতীয় নাটক রচনা ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে তিনকড়ি

বিশ্বাস, কেদার নাথ, ব্রজমোহন রায় প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এই জাতীয় যাত্রাপালা মূল মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়নি। নাটকগুলির আখ্যানাংশ গৃহীত হয়ে কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে। ভক্তিরসের প্রাবল্য, স্থূল হাস্যরসের ব্যবহার ও রোমহর্ষক রৌদ্ররসের সংমিশ্রণে পালাগুলি রচিত হ'য়েছে। মহাভারতের উপাখ্যান নিয়ে রচিত নাটকগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব' ও 'জনা' নাটকের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'বভ্রুবাহন', 'সাবিত্রী', 'উলূপী', 'ভীষ্ম', 'মন্দাকিনী, ও 'নরনারায়ণ' নাটকের আখ্যানভাগ মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' পত্রকাব্যে 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী,' 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী', 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী', 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা', 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' প্রভৃতি পত্রে পৌরাণিক চরিত্রগুলির নবজন্ম ঘটেছে।

রামায়ণের মতই মহাভারতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পুরস্কার' কবিতায় তিনি মহাভারতের কথা উল্লেখ করেছেন। 'বিদায়-অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'নরকবাস', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি নাটকাব্য ও নৃত্যনাট্যে মহাভারতীয় আদর্শের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির প্রেক্ষাপটে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত বলেই রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার সংলাপে নারীমুক্তি আন্দোলনের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে বলেছেন—

> 'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
> পূজা করি রাখিবে মাথায় ; সেও আমি
> নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে, সেও আমি নহি।'

—রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা শুধু মহাভারতের একটি চরিত্র মাত্র নয় তা একটি বিশেষ তত্ত্বের বাহন হ'য়ে উঠেছে।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দু'টি মহাকাব্য যুগ যুগ ধরে বাঙালী পাঠকের রসতৃষ্ণাকে যেমন পরিতৃপ্ত ক'রেছে তেমনি এই দুই মহাকাব্যের আখ্যান ও চরিত্র অবলম্বনে নূতন সৃষ্টির ফলেও বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। বাঙালী জীবনে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—'মহাভারতে দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের প্রতিবিম্বন···আমরা যাকে কবিত্ব বলি তাতে রামায়ণ সমৃদ্ধতর।' এই উচ্চতর মানবজীবনের প্রতিবিম্ব এবং উচ্চ কাব্যাদর্শের জন্যই বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারত সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হ'য়েছে।

# বাংলার শিশু সাহিত্য

শিশু সাহিত্য নামের মধ্যেই বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একান্তভাবে শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্যকে আমরা শিশু সাহিত্য নামে অভিহিত ক'রে থাকি। শিশু সাহিত্য শিশুদের জন্য রচিত হলেও তা একেবারে নৈপুণ্যহীন দুর্বল রচনা নয়। শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনা শিশু সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলেও তা একেবারে অবহেলার সামগ্রী নয়। শিশু মন একাধারে কল্পনাপ্রবণ, সংবেদনশীল। বিশ্বজগৎকে জানার আগ্রহ তার যেমন প্রবল তেমনি সে তার অনুসন্ধিৎসাকে পূর্ণ করার জন্য যথোপযুক্ত উত্তরের প্রত্যাশী। ছোট বলে তাকে এড়িয়ে গেলে তার স্পর্শকাতর মনে স্বাভাবিক ভাবেই আঘাত লাগে। তাই এই বিষয়গুলির প্রতি সচেতন থেকে শিশু সাহিত্য রচনা করা প্রয়োজন। শিশুর কল্পনাপ্রবণ মনের জগতে যথাযথ ভাবে পৌছানোর চেষ্টা করা, তার অনুসন্ধিৎসাকে বাড়িয়ে তোলা ও তার প্রশ্নকামী মনের উত্তর খুঁজে পাওয়া শিশু সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। তার সঙ্গে তার চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটানো, আকাশ-কুসুম কল্পনাকে ক্রমশঃ বাস্তবমুখী ও বিজ্ঞানভিত্তিক ক'রে তোলাও এ যুগের শিশু সাহিত্য রচয়িতাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নানা পাশে আবদ্ধ, তদুপরি দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা এদেশের শিশুদের মানসিক পঙ্গুতার অন্যতম কারণ। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা পাশের উপর যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তার মানসিক বিকাশের উপর তত জোর দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাই এদেশের শিশু শিক্ষার্থীদের করুণ অবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন —'চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ওই দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না একথা অতি পুরাতন।' শিশু সাহিত্যের মৌলিক দায়িত্ব হলো শিশুর কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির মধ্যে মিলনসাধন ঘটিয়ে তাকে বৃহত্তর কর্মজীবনের দায়িত্ব বহনের উপযোগী ক'রে তোলা। যে দেশ যত বেশী সমৃদ্ধ সেই দেশ তত বেশী শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনোযোগী। তাই অর্থ নৈতিক দিক

দিয়ে অনুন্নত দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলিতে শিশু সাহিত্যের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে দুরন্ত রাজপুত্রদের গল্পচ্ছলে নানা বিদ্যায় পারদর্শী ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি শিশু পাঠ্যগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের শিশু সাহিত্যের পুরোধা হিসাবে বিষ্ণু শর্মার নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। পুরাতন বাঙালী সমাজে শিশু সাহিত্য বলে তেমন কিছু ছিল না। শিশুর রসপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য সংস্কৃত শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলির সঙ্গে ছিল আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত গল্প। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'হিতোপদেশ', 'বত্রিশ সিংহাসন' ইত্যাদির বঙ্গানুবাদের সঙ্গে আরব্য রজনী, ঈশপের গল্প সে যুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু সচেতন ভাবে এদেশে শিশু সাহিত্য রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে যুরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসার লাভ করায় সেই সময় থেকেই বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক মানের শিশু সাহিত্য রচিত হতে থাকে। মূলতঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় মৌলিক শিশু সাহিত্যের আবির্ভাব, ক্রমবিকাশ ও পরিণতির পরিচয় লক্ষ্যগোচর হ'য়ে ওঠে।

শিশুর জগৎ নিছক কল্পনার, সেখানে বাস্তব জগতের সমস্যা প্রবেশাধিকার পায় না। দেশ-কাল ভেদে বিশ্বে নানা পরিবর্তন ঘটে গেলেও শিশুমন চির অপরিবর্তনীয়। শিশু মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে 'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।' এই বিরাট সংসার সমুদ্রের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে মানব শিশু যুগ-যুগান্তর ধরে একই ভাবে খেলা ক'রে আসছে। বিশ্বজগতের বয়সের তুলনায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আবার শিশু। তাই প্রত্যেক বয়স্ক মানুষের পরিণত মনের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক শিশু মন। সেই মন তাকে স্মৃতিচারী, অতীতচারী ক'রে আকস্মিক ভাবে শৈশবের জগতে টেনে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের শৈশব কোনোদিনই কাটে না তাই শিশু সাহিত্যও শুধু শিশুদের জন্য নয়—বয়স্কদের পরিণত মনের আড়ালে চাপা পড়ে থাকা শিশুমনের কাছেও তার রহস্যময় হাতছানি, পৌঁছে যায়। শিশুমনের মধ্যে একটা চিরন্তনত্ব ও সার্বজনীনতা আছে বলেই দেশ-কাল কিংবা ভাষা ভেদে রচিত বৈচিত্র্যময় শিশু সাহিত্যের মধ্যে আমরা রসানুভূতি বা রসাবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা ঐক্য লক্ষ্য করে থাকি। তার

মূল কারণই হলো শিশুর বিচিত্র কল্পনা ও আবেগ প্রবণতা। সহজ সরল ভাষায় শিশুমনের আবেগ ও কল্পনাকে স্পষ্ট ক'রে তোলা শিশু সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য।

শিশুর কল্পনার জগতে একদিকে যেমন ভূত-পেত্নী-দৈত্য-দানোর বিভীষিকা বর্তমান, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে সাত-সমুদ্র তের নদীর পার, তেপান্তরের মাঠ, পক্ষীরাজ ঘোড়া, ময়ুরপঙ্খী নৌকা, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র-কোটাল-পুত্রের কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুলকে আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা। সোনার-কাঠি-রূপোর-কাঠির যাদুস্পর্শে রাজকুমারীর ঘুম ভাঙানো, কিংবা নিঃস্তরঙ্গ জীবনের মাঝখানে অতর্কিতে লাঠি হাতে ডাকাতদলের ঝাঁপিয়ে পড়ার মত শ্বাসরুদ্ধকারী উত্তেজনার প্রয়োজন। বয়স্ক মানুষের বৃত্তির, পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ শিশু-মনের অন্যতম আকর্ষণ। তাছাড়া পাহাড়-সমুদ্র-অরণ্যানী, পশু-পাখী, বন্যজন্তু-জানোয়ার শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। শিশুর কল্পনার জগতে যেমন আছে ক্ষীর-সমুদ্র, তেমনি আছে হীরা-মুক্তার গাছ। কার্যকারণ সম্পর্ক সেখানে সর্বাংশে বজায় থাকে না। পশু-পাখি মানুষের মত কথা বলে, কল্পনার জাদুস্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে কুঁড়েঘর প্রাসাদে পরিণত হয়, রাজরাণী পরিণত হয় ঘুটেকুড়ানি দাসীতে। সুতরাং বাস্তবতা-অবাস্তবতার সীমা সেখানে মুছে গিয়ে লেখকের বর্ণনাভঙ্গীর দক্ষতায় এক অলৌকিক মায়ার জগৎ গড়ে তোলে। এই মায়াজগৎ নির্মাণের কুশলতার জন্যই শিশু-সাহিত্য এক উচ্চতর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক হ'য়ে ওঠে। বাংলা শিশু সাহিত্য মূলতঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কুলদারঞ্জন রায়, সুকুমার রায়, সুখলতা রাও প্রমুখের হাতে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখের অবদানও স্মরণীয়।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) ময়মনসিংহ জেলার মসুয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় 'সখা' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী ছড়া, উপকথা বৈজ্ঞানিক কাহিনী রচনায় তিনি বাংলার শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন। তাঁর লেখা 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'সেকালের কথা', 'টুনটুনির বই', 'গুপি গাইন ও বাঘা বাইন' প্রভৃতি গ্রন্থ আজও জনপ্রিয়।

কুলদারঞ্জন রায় (১৮ ৮-১৯৫০) উপেন্দ্রকিশোরের অনুজ। তিনিও মসুয়া গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কুলদারঞ্জনের প্রথম লেখা 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুরাণ ও বিদেশী সাহিত্যের ধারায় কুলদারঞ্জনের

নাম স্মরণীয় হ'য়ে আছে। 'রবিনহুড', 'ওডিসিয়ুস', 'ছেলেদের বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'কথাসরিৎ সাগর', 'পুরাণের গল্প', 'ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র' ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন! 'আশ্চর্য দ্বীপ' তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ গ্রন্থ।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র সুকুমার রায় বাংলা শিশু সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাল্যকাল থেকে সুকুমার রায় ছবি আঁকা ও মুখে মুখে ছড়া তৈরীর ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠরত অবস্থায় তিনি নাটকাভিনয় ও হাসির নাটক রচনায় উৎসাহিত হন। 'ননসেন্স ক্লাব' ও তার মুখপত্র 'সাড়ে বত্রিশভাজা' সুকুমার রায়ের উৎসাহে পরিচালিত হয়। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ফটোগ্রাফী ও প্রিন্টিং টেকনোলজি সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ' নিয়ে বিলাত যান। দেশে ফিরে এসে তিনি 'মনডে ক্লাব' গড়ে তোলেন। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। সুকুমার রায় স্বল্পায়ু ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই তিনি শিশুদের জন্য নানা ধরণের লেখা লিখে শুধু শিশুদের নয়, বড়দেরও মন জয় ক'রে নিয়েছিলেন। 'আবোল তাবোল' ও 'খাই খাই' সুকুমার রায়ের অনবদ্য ছড়ার বই। তার বাইরেও রয়েছে নানা মজাদার ছড়ার বিপুল ভাণ্ডার। 'অতীতের ছবি' ও 'বর্ণমালাতত্ত্ব' নামে দুটি প্রবন্ধের বই-ও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর লেখা গল্প গ্রন্থগুলি হলো —'হযবরল', 'পাগলাদাশু', 'বহুরূপী'। 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি', 'চলচ্চিত্ত চঞ্চরি'। ভাবুক সভা', 'শব্দকল্পদ্রুম', 'মামাগো' ইত্যাদি সুকুমার রায়ের মজার নাটক। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারদের জীবনী তিনি সহজ ভাষায় শিশুদের রচনা করেছিলেন। জীবজন্তুদের নিয়েও তাঁর রচনার সংখ্যা প্রচুর। শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডার সুকুমার রায় আয়তন ও মান উভয় দিক থেকেই সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন।

সুখলতা রাও (১৮৮২-১৯৬৯) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা ও সুকুমার রায়ের ভগিনী। পারিবারিক ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সুখলতা রাও শিশু সাহিত্য রচনায় বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুখলতা রাও রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'লালিভুলির দেশে', 'পথের আলো', 'নানান দেশের রূপকথা', 'নতুন ছড়া', 'নিজে পড়', 'নিজে শেখ', 'খেলার পড়া', 'ঈশপের গল্প', 'হিতোপদেশের গল্প' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভগিনী পুণ্যলতা

চক্রবর্তী ও সুলেখিকা ছিলেন। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' মনোরম স্মৃতিকথা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হ'য়ে আছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) দাক্ষিণ্য থেকে বাংলার শিশু সাহিত্য বঞ্চিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা, গল্প, নাটকে শিশুসাহিত্যের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর রচিত 'শিশু', 'প্রহাসিনী', 'খাপছাড়া', 'ছড়ারছবি', 'ছড়া', গল্পস্বল্প', 'হাস্যকৌতুক', 'সহজ পাঠ' ইত্যাদি বহুল পরিচিত গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'গিন্নী', 'পোস্টমাস্টার', 'অতিথি', 'ছুটি' ইত্যাদি গল্পে শিশুচরিত্রের সঙ্গে শিশু মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) শিল্পী হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত হলেও তাঁর রচিত শিশু সাহিত্যের মূল্য কোনো অংশেই কম নয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত গল্পগুলিতে একের পর এক চিত্র সজ্জিত ক'রে শিশুর কল্পনার জগৎকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল', 'আলোর ফুলকি', 'বুড়ো আংলা', 'রাজকাহিনী' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী সম্পদ হ'য়ে আছে।

শিশু সাহিত্য সুস্পষ্টরূপে দুইটি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারা একান্তভাবেই শিশুপাঠ্য। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদারের 'ঠাকুরদার ঝুলি' 'ঠাকুরমার ঝুলি' এই ধারার অন্তর্গত। অন্য ধারায় রয়েছে এমন সমস্ত রহস্য-রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী যা বড়দের মনকেও আকৃষ্ট করে। এই দ্বিতীয় ধারার উল্লেখযোগ্য রচনা ও রচনাকার হিসাবে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাংলার ডাকাত' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা শিশু সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দেশ-বিদেশের ধ্রুপদী গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে শিশু ও কিশোর পাঠকদের মেধা ও মনীষাকে যাঁরা ক্ষুরধার করে তুলতে চেয়েছেন তাঁদের মধ্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, অশোক গুহ, ঋষি দাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিশু সাহিত্য মূলতঃ শিশুদের জন্য প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত শিশু-কিশোর পত্রিকা হিসাবে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া 'রামধনু', ঝিলমিল', 'শুকতারা', 'শিশুসাথী' ইত্যাদি পত্রিকার বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দৈনিক 'আনন্দ-বাজার' ও যুগান্তর পত্রিকা সুদীর্ঘকাল ধরে সপ্তাহে একদিন সংবাদপত্রের সঙ্গে ছোটদের জন্য বিশেষ পৃষ্ঠা জুড়ে দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। আনন্দবাজারের 'আনন্দমেলা' ও যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি' কিশোর লেখক ও চিত্র-শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। পরবর্তীকালে 'আনন্দমেলা' পৃথক পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'কিশোরভারতী', 'পক্ষীরাজ', 'কিশোরবিজ্ঞানী' ইত্যাদি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিভিন্ন শিশুপত্রিকাকে অবলম্বন করে যে সমস্ত লেখক খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রভাতকিরণ বসু, কার্তিক দাশগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্রলাল ধর, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), বিমল দত্ত, সুনির্মল বসু, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, শৈলেন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলার জনপ্রিয় লেখকেরাও সব্যসাচীর মত শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ শিশু সাহিত্য রচনায় যথেষ্ট নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টেনিদা', সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা ইত্যাদি চরিত্র বাংলা শিশু সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি। ইন্দিরা দেবী, সীতাদেবী, শান্তাদেবী, মণি বাগচী শিশু-কিশোরদের জন্য গঠনমূলক রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কুইজ, বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান, শিশু সাহিত্যের নবতম সংযোজন। এ সমস্ত বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করছেন তাঁদের মধ্যে অমরনাথ রায়, পার্থসারথি চক্রবর্তী, সুনীল সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ছোটরা কি পড়তে চায়, কি পড়তে ভালোবাসে তার হিসাব পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তাই চিত্তাকর্ষক নানা বিষয়ই আজ শিশু সাহিত্যের উপকরণ হয়ে উঠেছে। বাংলা শিশু সাহিত্যের এই সমৃদ্ধিকরণ নির্দেশ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন—'বাংলার শিশু সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে সারাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনো কোনো বুদ্ধি, মহোত্তম কোনো কোনো মন: যার আদি পুরুষ বিদ্যাসাগর, যাকে রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে স্পর্শ

করে গেছেন, যাতে আছেন অবনীন্দ্রনাথের মত হৃদয়বান ও সুকুমার রায়ের মত গুণী পুরুষ, তার দুটো একটা রোগ লক্ষণে ভীত হবার কারণ দেখিনা, কেন না তার আপন ঐতিহ্যেই আরোগ্য সঞ্চিত আছে।' সুতরাং বাংলা শিশু সাহিত্যের যে অগ্রগতি শুরু হয়েছে ক্রমশই তা সামনের দিকে প্রবল বেগে এগিয়ে যাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

# বাংলার লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যের মধ্যে দেশের পুরাতন ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকসাহিত্য দেশের তৃণমূল থেকে গড়ে ওঠা জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় বলে তার মধ্যে সমাজ জীবনের সামগ্রিক চিত্র যে ভাবে প্রকাশিত হয় শিষ্ট বা অভিজাত সাহিত্যের মধ্যে তা তেমন ভাবে প্রতিফলিত হয় না। লোকসাহিত্য বলতে আমরা যে শ্রেণীর সাহিত্যের কথা বুঝে থাকি তার রচয়িতা নগর জীবনের কৃত্রিম জীবনযাত্রা, যান্ত্রিকতা ও পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত মানুষেরা নন। লোকসাহিত্য বা লোক সংস্কৃতির সঙ্গে যে মানুষগুলির কথা উচ্চারিত হয়ে থাকে তাঁরা শহর সংস্কৃতি থেকে দূরে থেকে নগর জীবনের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও আদিম সমাজ জীবনের রূপটিকে অবিকৃতভাবে ধরে রেখেছেন এবং তাকে তাঁরা অপরিবর্তিতভাবে নানা আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। গ্রাম বাংলার সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে যে সুখ-দুঃখের নানা অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে রয়েছে তাকে আশ্রয় করে সৃষ্ট হয়েছে বাংলার লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে পল্লীবাংলার মানুষের জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন। ভারতবর্ষের উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে উঠেছে সংস্কৃত কাব্য-মহাকাব্য, নাটক, বেদ-পুরাণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু গ্রামীন মানুষেরা, যাঁরা সংস্কৃত জানেন না, বেদ-পুরাণ যাদের কণ্ঠস্থ নয় কিন্তু সমাজগ্রন্থিকে অটুট রাখার জন্য তাঁরা নিজেদের ভাষায় মৌখিক নীতিমূলক যে সমস্ত বিষয় রচনা করেছেন সেগুলি লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। লোকসাহিত্য লেখ্য নয়, যুগ-যুগান্তর ধরে তা লোকমুখে প্রচলিত এবং দেবভাষা বা রাজভাষার দাক্ষিণ্য লাভ করেনি। লোকসাহিত্য লোকভাষার উপর নির্ভরশীল। তাই তার গতি সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

লোকসাহিত্য লোকমুখ থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। তা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি হলেও কালক্রমে তা এক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি বলে পরিচিতি লাভ করে। লোক সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথা বলা হয়ে থাকে

লোক সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা সর্বাংশে প্রয়োজ্য। যেমন—'All aspects of folk-lore, probably originally the products of individuals, are taken by the folk and put through a process of recreation, which through constant variation and repetition became a group product.' লোকসাহিত্যের স্রষ্টার পরিচয় দিতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন—'তাহা সমষ্টিরই সৃষ্টি, ব্যক্তির সৃষ্টি নহে।' লোকসাহিত্য যে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, সমগ্র লোক সমাজের মধ্যে তার অবস্থান এমন ইঙ্গিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়, তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে।'

প্রকৃতই বাংলার লোকসাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব প্রাণ সম্পদগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। বঙ্গপ্রকৃতির সজীবতা নিয়ে রচিত হয়েছে বাংলার লোক-সাহিত্য। লোকসাহিত্য ছন্দ-অলঙ্কার কিংবা ব্যাকরণের অনুগত নয়। তাই বিদগ্ধ রুচির কাছে তার অশুদ্ধতা প্রতি পদে ধরা পড়লেও তার মধ্যে যে ঔদার্য ও আন্তরিকতার স্পর্শ মাখানো রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। রামায়ণ, মহাভারতে কিংবা পুরাণের মর্মস্পর্শী কাহিনীতে যা বর্ণিত হয়েছে তাকে নিজের মুখের ভাষায় অন্যের অন্তরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাকুলতায় যাত্রা-পাঁচালি-কথকতার সুরে বাংলা লোকসাহিত্যের যে ধারা সৃষ্ট হয়েছে তার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এমন কতকাল চলেছে দেশে, বরাবর রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা। সীতার বনবাস, কর্ণের কবচ দান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব ত্যাগ। দেশে তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবন-যাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল, যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যেও মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে—মানুষের শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতা হেয় করতে পারে না, তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। সেদিন দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন কি, যে সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ এ দেশের জনসাধারণের চিত্তভূমিতে।' সুতরাং বোঝা যায় উচ্চ আদর্শবোধ ও সমাজ গঠনের প্রেরণা নিয়েই বাংলাদেশের

প্রত্যন্ত ভূমিতে গড়ে উঠেছিল বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ, যা লোকসাহিত্য নামে পরিচিত।

বাংলার লোকসাহিত্য গড়ে ওঠার পেছনে বাঙালীর ধর্মীয় জীবনযাত্রার পরিচয় যেমন রয়েছে তেমনি তার বারো মাসে তের পার্বণকে কেন্দ্র ক'রে গৃহস্থের সংসারে আচরিত ব্রতগুলির ভূমিকাও খুব কম নেই। আবার বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের কর্মক্ষেত্রে ক্লান্তি ও শ্রান্তি নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত কর্ম-সঙ্গীতগুলিও বাংলার লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে ছড়া, ধাঁধা, গাথা, কথা, গীতিকা ইত্যাদি। তার সঙ্গে রয়েছে নানা জাতের লোকসঙ্গীত।

বাংলা লোকসাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাণ্ডার হলো ছড়ার। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—'বাংলার লোকসাহিত্যের আলোচনায় ছড়াই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।' বাংলা ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে একটি আদিম সৌকুমার্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে 'বাল্যরস' নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে; গায় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ, সরস এবং যুক্তিসঙ্গতিহীন। এই ছড়াগুলিকে স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য। সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইবে না। কারণ ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, এই ছড়ার মধ্যে আমাদের পিতৃপিতামহ-গণের শৈশব নৃত্যের নূপুর নিকণ ঝংকৃত হইতেছে। অথচ আজকাল লোকে এই ছড়াগুলি ক্রমশঃই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটদের অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব পুরাতন জাতীয় সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে সংগ্রহের দায়িত্ব অন্যের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হননি। নিজেই ছড়াগুলি সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।' বাংলা ছড়াগুলিকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—ঘুমপাড়ানি ছড়া, ছেলে-ভুলানো ছড়া, নৈসর্গিক ছড়া, আবৃত্তির ছড়া, খেলার ছড়া ইত্যাদি। ছড়ার জগৎ হলো অপরিণত মনের শিশুর জগৎ। সেখানে রয়েছে কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ। যুক্তি-তর্ক কিংবা ব্যাকরণের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করা ছড়ার কাজ নয়।

তা হলো পণ্ডিতের। তাই চুলচেরা বিশ্লেষণের চেয়ে আবেগ ও অনুভূতি ছড়ার প্রধান অবলম্বন। তবে ছড়াগুলির মধ্যে অতীত ইতিহাসের নানা উপকরণও যে ছড়িয়ে রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছড়াগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন—'কোন ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার এই অবজ্ঞাত ছড়া-সাহিত্য হইতে সম্ভবপর না হইলেও, অন্যবিধ সত্যের পরিচয় এই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্য জীবনের একটা বৃহৎ দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশব জীবনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।' অন্নদাশঙ্কর রায় ছড়াগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সামাজিক ইতিহাসের কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—'নকশী কাঁথার মতো ছড়াও একটি নারী শিল্প। খোকাখুকুকে ঘুম পাড়ানোর সময় তাদের জন্যেই মা ঠাকুমা মাসী-পিসীদের এই সৃষ্টি। তাঁরা কেউ কখনো ভাবেননি যে তাঁদের মুখের কথা ছাপার হরফে বই হয়ে বেরোবে আর পণ্ডিতরা তার মধ্যে নৃতত্ত্ব; সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাস খুঁজবে। তবে চেষ্টা করলে আগডুম বাগডুম'কে পাল বা সেন যুগের আওতায় আনা যায়। যখন পতাদিক হতো ডোমরা। ঘোড়সওয়ার সৈনিকও হতো। 'বর্গী এলো দেশে' যে বর্গীর হাঙ্গামার স্মারক এটা তো সকলেই স্বীকার করেন।'

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে গ্রামবাংলার মানুষের বাস্তববুদ্ধি ও বহুদর্শিতার পরিচয় লুকিয়ে আছে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উইলিয়ম মর্টনের দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহে ৮০৩টি প্রবাদ সংকলিত হয়। বঙ্গদূতের সম্পাদক নীলরত্ন হালদারও প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ লঙ দুই খণ্ডে বাংলা প্রবাদ প্রবচন 'প্রবাদমালা' নামে প্রকাশ করেন। ডঃ সুশীলকুমার দে 'বাংলা প্রবাদ' এ বিষয়ে সবচেয়ে বৃহত্তম সংকলন গ্রন্থ।

বাংলা লোকসাহিত্যের আর একটি বিশেষ শাখা হলো কবিগান। ভারত-চন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবের মধ্যবর্তীকালকে বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যাযুগ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এ সময়ে লেখ্য সাহিত্য রচিত হয়নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষীণ দীপশিখাটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এ যুগে গ্রহণ করেছিলেন কবিওয়ালারা। কবিওয়ালারা আসরে

দাঁড়িয়ে মুখে মুখে যে সমস্ত গান রচনা করতেন তাদের কবিগান নামে উল্লেখ করা হয়। ড. সুশীলকুমার দে বাংলা দেশে কবি গানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—'The existence of Kabi-songs may be traced to the beginning of the 18th century or even beyond it to the 17th ; but the flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830.' কবিগানের এই সমৃদ্ধির যুগে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, লালু-নন্দলাল, রামজি, রঘু, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বেনে, হরুঠাকুর, রাসু ও নৃসিংহ, রামানন্দ নন্দী, রামবসু, নীলু-রামপ্রসাদ, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি রচনায় কবিওয়ালারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবিওয়ালারা অনেকেই ছিলেন সমাজের অনভিজাত শ্রেণীর মানুষ তাই তাঁদের রচিত কোনো কোনো পদে রুচি-বিকৃতির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে কবিওয়ালারা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী নন। কবিগানের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিত মত জবাবেই সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে ; তাহার উপরে চার জোড়া ঢোল, চারখানা কাঁসি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চীৎকার ; বিজন বিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিকিতে পারেন না।'

বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় গাথা ও গীতিকার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। আখ্যানধর্মী কাব্যকে গাথা এবং সেগুলি যখন সুর সহযোগে গীত হয় তখন তাকে গীতিকা নামে অভিহিত করা হয়। বাংলা গাথা ও গীতিকার ধারায় 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার নাম উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' নামক পত্রিকায় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি লোক-গাথা প্রকাশ করেন সেগুলি পড়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সেগুলি সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেন চন্দ্রকুমার দে, কবি জসিমুদ্দিন প্রমুখের উপরে। তাঁরা ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত পালাগান সংগ্রহ করেন তার প্রথম খণ্ড 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, কঙ্ক-লীলা ইত্যাদি পালা অত্যন্ত সুন্দর পালাগুলিতে বিরহ-মিলনে মানবিক প্রেম অপরূপে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

গাথা-গীতিকা পর্যায়ে গোপীচন্দ্রের গানের কথাও উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ার্সন সাহেব স্থানীয় গায়কদের কণ্ঠ থেকে 'গোপীচন্দ্রের গান' সংগ্রহ করেন এবং তা মানিকচন্দ্র 'রাজার গান' নামে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনার ফলে তা সাধারণের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য তিনজন যোগী ভিখারীর মুখ থেকে গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি অধ্যাত্মসম্পর্কশূন্য। তার মধ্যে মানবিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গোপীচন্দ্রের গান নাথযোগী সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত।

বাঙালী জীবনে আমরা নানা ব্রতের পরিচয় পেয়ে থাকি। এই ব্রতগুলির মধ্যে বসুধারাব্রত, ভাদুলী ব্রত, যমপুকুর ব্রত. সেঁজুতি ব্রত, সুবচনীর ব্রত ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই ব্রতগুলির সঙ্গে ব্রতের কাহিনী বা ব্রতকথা গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে। ব্রতকথা, উপকথা, লোককথা, রূপকথা ইত্যাদি নিয়ে বাংলা লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ব্রতকথার কাহিনীতে লৌকিক দেব-দেবতার প্রতি ভক্তি ও ভক্তের সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপকথা, লোককথা, রূপকথার সঙ্গে ব্রত বা পূজা পার্বনের কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলার ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপকথা-গুলিকে 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলিতে' সংকলিত করে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র 'ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল' ও 'বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট লাইফ' গ্রন্থদ্বয়ে গ্রামবাংলার উপকথা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত সংকলিত হয়েছে। লীলা মজুমদারের সযত্ন প্রয়াসে গ্রন্থ দুটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সুধীজনের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতার কারণ হয়ে উঠেছেন।

বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারায় লোকসংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গানের বাণী-বিন্যাস সাহিত্যেরই অঙ্গ। তাই লোকসাহিত্যের শাখা হিসাবে লোকসঙ্গীতকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি দেখা দিতে পারে না। বাংলার বাউল গান, কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলাহাড়ি ইত্যাদি গৌণ উপধর্ম সম্প্রদায়ের গান, শব্দগান, মুর্শিদা গান, জারিগান, হিন্দু ও মুসলিম

উভয় সম্প্রদায়ের বিয়ের গান ইত্যাদি নিয়ে বাংলার লোক সঙ্গীতের জগৎ যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি পটুয়ার গান, ছন্দ পেটানোর গান, টহলদারী গান, বোলান গান ইত্যাদিতে তা সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের রহস্যময় দিক হলো ধাঁধা। তাছাড়া খনার বচন, ডাকের বচন ইত্যাদিও বাংলার লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দিক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, লোকসাহিত্য বাংলার সম্পদ—তার মধ্যে বাংলার চিরনূতন ও চিরপুরাতন রূপের সংমিশ্রণ ঘটে গিয়েছে। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি আমাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই তার ধারাবাহিক চর্চার দিকে সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

# বাংলার বাউল

সুফী ধর্মমতের সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও নানা গৌণ উপধর্মের ধর্মগুরু ও শিষ্যেরা মূলত বাংলাদেশে একত্রিতভাবে বাউল নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। সাধারণ ভাবে ধর্মগ্রন্থ বা আচার সর্বস্ব ঈশ্বর-সাধনার পথ পরিত্যাগ ক'রে যাঁরা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্বকে উপলব্ধি করে মানুষকে ভজনা করেন এবং দেহকেই সর্বতীর্থসার বলে গ্রহণ ক'রে যাঁরা মনের মানুষের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের সহজিয়া সাধক নামে অভিহিত করা হয়। সহজিয়া সাধকদের চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ। মূলতঃ এই চার শ্রেণীর সহজিয়া সাধকদের মধ্যে যাঁরা সুফীধর্মের প্রভাবে ইসলামী শব্দ ও ধর্মতত্ত্ব অনুসরণ করে থাকেন তাঁদের সাঁই ও দরবেশ বলা হয়ে থাকে। হিন্দু বাউলেরা মূলতঃ চৈতন্যদেবকে প্রধান বলে গ্রহণ ক'রে থাকেন। বৈষ্ণব ধর্মসাধনাকে প্রাধান্য দিয়ে যাঁরা সহজ সাধনা বা মনের মানুষের সাধনা ক'রে থাকেন তাঁদের আউল ও বাউল বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বাউল ধর্মগোষ্ঠীর সীমারেখাকে এত সহজে বেঁধে দেওয়া যায় না। তার কারণ হলো বাংলার প্রখ্যাত বাউল লালন শাহ নিজেকে সাঁই, দরবেশ, ফকির বলে উল্লেখ করেছেন আবার হিন্দু বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ আউল চাঁদকে দরবেশ, ফকির নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ—এই শব্দগুলির সাহায্যে প্রথাগত ভাবে, আনুষ্ঠানিক কোনো ধর্মমত গ্রহণ করে ঈশ্বর সাধনার বিরোধী দেহাত্মবাদী-ধর্মসাধকদের কথা বোঝানো হয়ে থাকে। তাঁদের সকলকে একসঙ্গে বাউল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

'বাউল' শব্দটির অর্থ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলে থাকেন সংস্কৃত 'বাতুল' বা 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। আবার কারো কারো মতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বাউলেরা সাধনা করেন বলে এই সাধনাকে বায়ুপ্রধান বা বাউল নামে অভিহিত করা হয়। আরবী শব্দ অনুযায়ী 'বাউল' শব্দের অর্থ হলো প্রস্রাব। বাউল সাধনায় চারিচন্দ্র বা বিন্দুর সাধনা বলে একটি বিশেষ পর্যায় আছে। মল, মূত্র,

রজঃ, বীর্য এই চারিটিকে চারিচন্দ্র নামে অভিহিত করা হয়। বাউলেরা নির্বিকার ভাবে এই চারিচন্দ্র সেবন ক'রে থাকেন। তাই বাউলদের নিন্দাসূচক ভঙ্গীতে ক'রে থাকেন। তাই বাউলদের নিন্দাসূচক ভঙ্গীতে 'মুত খেকো ফকির' বলা হয়। আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই শব্দগুলি অর্থে অর্বাচীনকালে গৃহীত হ'য়েছে। এগুলি বাংলাদেশে এসেছে মুসলমান বিজয়ের অনেক পরে। চৈতন্য পরবর্তীকালে সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনা এবং সুফী সাধনার ধারা একত্রিত হ'য়ে বাউল ধর্মগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। তাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বাউল ধর্মসাধনা ও ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ ভাবে ব্যাপ্তি লাভ করে। মূলতঃ উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর মানুষের কাছে নিম্নবর্গের মানুষেরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে শোষিত হওয়ার ফলে বাউল শ্রেণীর অন্তর্গত নানা উপধর্ম সম্প্রদায় প্রতিবাদী শক্তিরূপে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করে। কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলাহাড়ি, খুসীবিশ্বাসী, দশনামী ইত্যাদি নানা গৌণ উপধর্মের মানুষকে একত্রে 'বাউল' নামে অভিহিত করা হ'য়েছে।

বাউল সাধনা গুরুবাদী, গুরুকে কেন্দ্র ক'রে বাউলদের জীবন ও অধ্যাত্ম-সাধনা। গুরুই হলো তাঁদের কাছে পথ প্রদর্শক। গুরুকেই তাঁরা ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে থাকেন। বাউলের শিক্ষাদাতা ও দীক্ষাদাতার ভূমিকায় বাউলের জীবনে গুরুর ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, সন্ন্যাসগুরু ও সঙ্গীতগুরু বাউলের জীবনকে পূর্ণতা দান করে। তাই বাউলেরা সমস্ত কাজের আগে গুরুকে স্মরণ ক'রে থাকেন। বাউলেরা কোরান, পুরাণ, বেদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করে থাকেন। তথাকথিত দেববাদেও তাঁদের বিশ্বাস নেই। বাউলের সাধনা প্রেমের সাধনা, মনের মানুষের সাধনা এবং রসের সাধনা। তাই রসিক হিসাবে তাঁরা জয়দেব, চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্য প্রমুখকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

বাউল দর্শন মানব প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেম শাশ্বত, চিরন্তন ও স্বর্গীয়। পারস্পরিক প্রেম ব্যতীত মানব জীবন নিষ্ফল। এই চিরন্তন প্রেম বা মনের মানুষের সন্ধানে বাউলের পথে-প্রান্তরে পরিভ্রমণ। প্রতিটি গৃহের আঙিনায় এই প্রেমের বাণী সিঞ্চন করাই বাউলের কাজ। মানুষের মধ্যে বাউল তাঁর ঈপ্সিত খুঁজলেও তথাকথিত সামাজিক অনুশাসন মেনে চলার দায় তাঁর নেই। বাউলেরা সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার বিরোধী, তাই তাঁদের গানে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানতাবোধের কথা সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হ'য়ে উঠেছে।

বাউলেরা তথাকথিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করেন। তাই তাঁরা অনায়াসে বলতে পারেন—

'তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুর্শেদে।'

বাউল ধর্মসাধনার মধ্যে এক ধরণের রহস্যময়তা আছে। এই রহস্যময়তার অন্তরালে বাউলের ধর্ম ও দর্শন তাঁদের গানগুলিতে প্রচ্ছন্ন ভাবে ধরা পড়েছে। যেমন—

'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরশি নগর
এক পড়শি বসত করে
... ... ...
সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে।'

বাউলেরা ঐক্যের পূজারী, মনুষ্যত্বের পূজারী। তাই সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা লক্ষ্য ক'রে বাউলের বিদ্রূপ ক'রে বলেন—

'যদি খতনা দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনী চিনি কিসেরে॥'

জাত-পাত, স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা বিশ্ববিধাতা কিংবা প্রকৃতির ইচ্ছা নয়, জন্ম মৃত্যুর চক্রাবর্তনে এই পৃথিবীতে মানুষের যাতায়াত। তার অন্ন-প্রাণের যোগান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য একই রকম। তবু মানুষের অন্তরে যে বিভেদের জন্ম সেদিকে লক্ষ্য রেখে লালন ফকির বলেছিলেন—

'একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেয়া
কেউ ছোঁয় না কারো ছোঁয়া
বিভিন্ন জল কোথায় পান।'

বাউলের সাধনা যেহেতু ঈশ্বরকেন্দ্রিক নয়, মানবকেন্দ্রিক—তাই মনের

মানুষের সাধনার জন্যে তাঁর কোনো বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন হয় না। অন্তরের মধ্যে মানুষের জন্য যে প্রেমের প্রদীপ অনির্বান শিখারূপে জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছে তার কাছে বাহ্য উপাসনা নিষ্ফল বলে বাউলেরা বলতে পারেন—

'আছে যার মনের মানুষ
মনে সে কি জপে মালা
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।'

বাউল গানের রচয়িতা হিসাবে লালন ফকিরের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিনাথ মজুমদার কাঙ্গাল হরিনাথ বা ফিকির চাঁদ ছদ্মনামে বাউল গান রচনা ক'রে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বাউলেরা যেহেতু নানা উপধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাই বিভিন্ন উপধর্ম সম্প্রদায়ের মতাদর্শ বিভিন্ন রচয়িতার গানে ধরা পড়েছে। যেমন, লালশশীর গান বা ভাবের গীতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব যেমন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তেমনি সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের মূল কথা লক্ষ্য করা যাবে কুবির গোঁসাই কিংবা যাদুবিন্দুর লেখা গানে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ অঞ্চলে পরিভ্রমণকালে বাউল গান বিশেষতঃ লালন ফকিরের গান সম্পর্কে আগ্রহী হ'য়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ক্ষিতিমোহন সেনের উদ্যোগে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বাউল গান সংগৃহীত হয়। বাউল গানের সংগ্রাহক হিসাবে মনসুরউদ্দীনের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল গান সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করে এই দিকটির প্রতি বিদগ্ধ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদাই হ'য়ে উঠেছেন। বাউল গানের সংগ্রাহক হিসাবে আনারুল করিমের নাম উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালে ডঃ সুধীর চক্রবর্তী সাহেব ধনী ও বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শন ও তাদের গান এবং দেহতত্ত্বের গান সংকলন ক'রে বাউল গানের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মূলতঃ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বাংলার যে বাউল গান রচিত হ'য়েছে তার ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। কেঁদুলির মেলায়, কোটাসুরের বাউল-বৈষ্ণব সম্মেলনের এখনো বাউল গান ও বাউল ধর্মের সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

———

## সহায়ক গ্রন্থাদি

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য—
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—ডঃ ভূদেব চৌধুরী

৪ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

৫. সাহিত্যকোষ : নাটক : কথাসাহিত্য—ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত

৬. সাহিত্য ও শিল্পলোক—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

৭. বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

৮. যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র—ডঃ ভবতোষ দত্ত

১০. মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার

১১. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

১২. ভারতাত্মা কবি কালিদাস—প্রবোধচন্দ্র সেন

১৩. রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

১৪. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার—জাহ্নবী চক্রবর্তী

১৫. সাহিত্য চর্চা—বুদ্ধদেব বসু

১৬. সত্য যে কঠিন—ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ

১৭. বাংলা উপন্যাসে স্বদেশচিন্তা—ডঃ শ্যামল রায়

——